মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই

ভারতের রাষ্ট্রভাষা, নয়া-বাঙ্গলা, তীর্থ-সপ্তক, হুগলী জেলার ইতিহাস,
India's National Language প্রভৃতি পুস্তকের লেখক,
বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং
'কায়স্থ-পত্রিকা'র প্রাক্তন সম্পাদক

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি-এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

মূল্য দুই টাকা

পৌষ—১৩৫৪

প্রিণ্টার
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

নিবেদন

'হুগলী জেলার ইতিহাস' সঙ্কলন করিবার সময়, বাঙ্গলা দেশের বিপ্লববাদের সহিত চন্দননগর তথা হুগলীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখিয়া উহা মল্লিখিত ইতিহাসের মধ্যে সংযুক্ত করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু বিস্তারিত ভাবে উক্ত পুস্তকের মধ্যে এই সমস্ত বিবরণ দিতে যাইলে, গ্রন্থের কলেবর অসম্ভব ভাবে বৃদ্ধি পাইবে এবং বিদেশী-শাসনে আমাদের হাত তখন শৃঙ্খলিত ছিল বলিয়া, সে ইচ্ছা আমার ফলবতী হয় নাই।

জাতীয় বন্ধনমুক্তির প্রাক্‌কালে, এই বৎসর ১১ই আগষ্ট তারিখে অগ্নিযুগের দ্বিতীয় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর স্মৃতি-পূজা, চল্লিশ বৎসর পর সর্ব্বপ্রথম সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় বঙ্গের 'হারমোডিয়াস্' মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কানাইলাল দত্তের স্মৃতি-পূজা এবং তাঁহার নশ্বর দেহ কালীঘাটের মহাশ্মশানে যে স্থানে ভস্মীভূত হইয়াছিল, তথায় একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার আমার বড় বাসনা হয়। ভগবান সুযোগও জুটাইয়া দিলেন; ২১শে অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন 'গোন্দলপাড়া সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে' হুগলী জেলার ব্রতচারীদিগের যে সম্মেলন হয়, উহাতে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হয় এবং উক্ত সম্মেলনে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত, ডাঃ হীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ

ওসমান প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনে সর্ব্বপ্রথম চন্দননগরের সুসন্তান কানাইলালের স্মৃতি পূজা ও স্মৃতিরক্ষার জন্য, সকলকে আবেদন জানাইবার আমার সৌভাগ্য হয় এবং বলা বাহুল্য প্রত্যেকেই তাহা অনুমোদন করেন।

১০ই নভেম্বর কানাইলালের মৃত্যু দিবসে যে সভা আহুত হয়, সেই সভার সাফল্যের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু-মল্লিক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য আমায় বহু ভাবে সহায়তা করেন। সুরেশবাবু 'আনন্দবাজার পত্রিকার' উক্ত দিবসে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং আমাকে কানাইলালের সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিতে অনুরোধ জানান। তাঁহার নির্দ্দেশে 'কানাইলাল' লিখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু বিপ্লবীদের জীবন কথার মাল মশলা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ; শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় লিখিত কানাইলালের জীবনী আজও নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং অন্যান্য পুস্তকাদিতেও কানাইলাল সম্বন্ধে যে দু'এক কথা লিখিত আছে, তাহাও বিক্ষিপ্ত বলিয়া, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি আনন্দবাজারের জন্য আমার রচনা সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হই নাই।

পরে কানাইলাল দত্তের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলিত

করিলে, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় উহা দেখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলা বাহুল্য যে, তাঁহার আগ্রহেই আজ ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

কানাইলালের তিরোধানের তিন বৎসর পরে, আমার জন্ম হয়; দেশমাতৃকার উদ্ধার কল্পে স্বাধীনতার বেদীমূলে যে প্রথম শহীদের দল আত্মবিসর্জ্জন দেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও জীবনেতিহাস এ যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল এবং আমিও তাহাদের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতাম না। সেই যুগে রাজদ্রোহের ভয়ে, ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আলোচনা বা সংবাদপত্রে কিছু লেখা একপ্রকার অসম্ভব ছিল বলিয়া, এই গোপন বিপ্লবীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী সুষ্ঠুভাবে সঙ্কলন করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি কানাইলালের জীবনী রচনা করিতে যে সকল পুস্তক হইতে যতটুকু সাহায্য পাইয়াছি, তাহাই সযতনে গুছাইয়া একত্র করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। যদি ভবিষ্যতে আরো কিছু মাল-মশলা পাই, তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবদ্ধ করিব এবং পাঠকগণের মধ্যেও যদি কেহ কোন ঘটনার বিষয় কিছু অবগত থাকেন, আমায় তাহা জানাইলে, আমি বাধিত হইব এবং সানন্দে তাহা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিব।

এই পুস্তক রচনায় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

কানুনগোই, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত পুস্তকাদি হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেইজন্য তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু কানাই-লালের কয়েকখানি দুঃপ্রাপ্য চিত্র আমাকে দিয়াছেন এবং 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ব্লক দুইটি আমায় ব্যবহার করিতে দিয়াছেন বলিয়া, উভয়কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য (শিবপুর) পুস্তকের প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি 'দীপালী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, আমার অনুরোধে 'কানাইলাল' সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছেন ; উক্ত কবিতাটি এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি এবং কবিবরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীমান পলাশকুমার মিত্র পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সযত্নে নকল করিয়া দিয়া আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহাকেও আমার আশীষ জানাইতেছি।

"বিশ্বম্ভর-ধাম"
জেজুর পোষ্ট, হুগলী
১০ই পৌষ, ১৩৫৪

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের

মহীয়সী জননী

স্বর্গতা ব্রজেশ্বরী দেবীর

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

"মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই"

উৎসৃষ্ট হইল

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

সূচী

চিত্রসূচী

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১।	হুগলী জেলার ইতিহাস	...	৬৲
২।	তীর্থ-সপ্তক	...	২৲
৩।	নয়া-বাঙ্গলা	...	৩৲
৪।	মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই	...	২৲
৫।	জেজুরের মিত্রবংশ	...	১৲
৬।	ভারতের রাষ্ট্রভাষা	...	॥০
৭।	India's National Language	...	॥০
৮।	মহাবিপ্লবী রাসবিহারী (যন্ত্রস্থ)	...	৩৲
৯।	মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল (যন্ত্রস্থ)	...	১৲
১০।	মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরাম (যন্ত্রস্থ)	...	১৲
১১।	আশুতোষ মিত্রের জীবনী	...	।০

কানাইলাল

নরের মাঝে সব্যসাচী, পশুর দলে সিংহ,
ভীরুর মাঝে বীরোত্তম, পতঙ্গেতে ভৃঙ্গ,
বিহগদলে গরুড় তুমি, গ্রহের মাঝে সূর্য্য,
ছন্দে বর-গায়ত্রী গো, বাদিত্রেতে তূর্য্য,
বিপ্লবের মহাভারত-প্রণেতা ব্যাসাচার্য্য—
স্মরণ করি, বরণ করি,
প্রণাম করি তোমারে আজি আর্য্য।

দেশের গুরু শিকলি ভাঙি দানিতে তারে মুক্তি
কর নি তুমি কাহারো সাথে কখনো কোনো চুক্তি
ক্ষমিলে নাকো সখার দ্রোহ করিয়া তারে হত্যা
দেখায়ে দিলে তিমিরময় সুড়ঙ্গের রথ্যা।
বিদেশী রাজহস্তে কাঁপি উঠিল রাজদণ্ড—
চাহিল তারা নির্য্যাতনে
যজ্ঞ তব করিয়া দিতে পণ্ড।

গলায় পরি ফাঁসির রসি হাসির শশী আস্তে
মৃত্যু পদে মূর্চ্ছা গেল দেখি প্রাণের লাস্তে
জীবন নব-জীবনে হল অমর অকলঙ্ক
মরণ তব রচিল গীতা বাজায়ে জয়-ডঙ্ক।
সেদিন বীর, তপ্ত তব লোহে যা ছিল ভাব্য—
স্ফুট তা আজি, মরণ-জয়ী
ত্রিবর্ণেতে রচিত মহাকাব্য।

বিপ্লবের হে ঋত্বিক, বিদ্রোহের পার্থ,
সাগ্নিক এ যজ্ঞে নব দধীচি নিঃস্বার্থ,
মৃত্যু তব মিথ্যা নহে, ব্যর্থ না ও ক্ষুদ্র
সুদুর্গম পন্থে সে যে মশালালোক রুদ্র।
জাগ্রত এ ভারতে তুমি নবীন দ্রোণাচার্য্য—
স্মরণ করি, বরণ করি,
প্রণাম করি তোমারে আজি, আর্য্য।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সহীদ প্রফুল্ল চাকী

ফাঁসীর সত্যেন

শ্মশানে কানাইলাল

মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই

—এক—

বিপ্লববাদের পূর্ব্বাভাষ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষে সহিংস বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং বাঙ্গলা দেশেই ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খলভার বাঙ্গলার কয়েকজন তরুণের কাছে দুঃসহ বোধ হইয়াছিল বলিয়া, মাতৃভূমির মুক্তি সাধনায় তাঁহারা দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কানাইলাল দত্ত, উক্ত দলের অন্যতম প্রধান যাত্রী।

বাঙ্গলা দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদ ব্যাপ্তি লাভ করিবার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গলার কয়েকজন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া, এই সুপ্ত জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার রচনার মধ্যে দেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলেন :

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশকোটী ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া. ছয়কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে. নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে। চল চল অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি·—সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব—মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

তারপর তিনি 'আনন্দ-মঠের' মধ্য দিয়া দেশবাসীকে দীক্ষা দিলেন "আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী—আমরা বলি জন্মভূমিই জননী" আর উদাত্ত সুরে গাহিলেন:

বন্দেমাতরম
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার জাতীয়তামূলক নাটকাবলি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াও, বঙ্গদেশে স্বাদেশীকতার প্রসারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তিনি স্বদেশ রক্ষার জন্য মৃত্যু যে, ধর্ম্মকার্য্যে মৃত্যু তাহাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন।

"মনে ছিল কাশীধামে ত্যজিব জীবন
কিন্তু শুনি তোমার বচন
সে বাসনা নাহি আর
যথাসাধ্য হ'ব তব কার্য্যে অনুকূল
ক্ষুদ্র কার্য্য আমা হ'তে হলে সমাধান
ভাবিব মা সার্থক জনম
বুঝিয়াছি কথায় তোমার
যাগ যজ্ঞ তপ যপ নাহি কিছু হেন
মাতৃভূমি পূজা সম।"

তিনি অন্যত্র বলেন—"এমন হিন্দু অতি বিরল ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে কিছুমাত্র উত্তেজিত হয় না। আত্মীয় রক্ষা, স্বদেশ রক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করে না। কিন্তু দেখ বিধর্ম্মী দেব-দেবী ভঙ্গ করছে, হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা করে, দেব দেবী নিয়ে পলায়ন করে; আরও দেখ মৃত্যুভয় হিন্দুর সত্যই নাই; যাদের শত্রুরা ভীরু বলে জানে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবী তীরে নিয়ে যেতে তারা উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। তুমি যদি তোমার উপদেশ ও আদর্শে বোঝাতে পার—মাতৃভূমির নিমিত্ত, স্বজন রক্ষার নিমিত্ত, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য, শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ কাশী-মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়, গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুবৎ

ফলপ্রদ, তা হ'লে অনেকে তোমার মতানুবর্ত্তী হবে—ভারত অজেয় হবে।"

মহাকবির সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম, ছত্রপতি প্রভৃতি নাটকগুলি বাঙ্গলাদেশে জাতীয়তা প্রসারে যে, কি ভাবে সহায়তা করে, তাহা ভাষায় উল্লেখ করা যায় না। এই নাটকগুলির মধ্য দিয়া জাতীয়তার উৎস প্রবাহিত হইতে দেখিয়া, বৃটিশ সরকার এই তিনখানি নাটকের প্রচার ও প্রসার ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রহিত করিয়া দেন। চল্লিশ বৎসর পরে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বর্ত্তমানে এই পুস্তকগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন।*

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দেখিয়া লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক বলিয়াছিলেন যে, আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য শত সহস্র বক্তৃতামঞ্চ হইতে যাহা করিতে সমর্থ হইনা; গিরিশচন্দ্র একাকী রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়া তদপেক্ষা দেশের অধিক কাজ করিতেছেন। সিরাজের চরিত্র জাতীয়তা প্রসারে সহায়ক হওয়ায় তৎকালীন নেতা আবুল কাসেম ডাক্তার গফুর, মুজিবর রহমান প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথকে বলিতেন "মহাশয় পঞ্চাশটা স্বদেশী সভায়

*গিরিশ সঙ্ঘ, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন এবং গিরিশ নাট্য সংসদ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

যাহা হয় না, সিরাজদ্দৌলার একরাত্রির অভিনয়ে তাহার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয়।"

গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও ফিরিঙ্গীদের বিতাড়িত করিবার জন্য অমাত্যগণকে বলিতেছেন :

"ওহে হিন্দু-মুসলমান
এসো করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব বিবরণ
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন,
আমি মুসলমান করি বাক্যদান
ভুলে যাব যাহা কিছু মনে
পূর্ব্বকথা আলোচনা নাহি প্রয়োজন।
সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত,
বাঙ্গলার ক্ষতি নহে তাহে
হয় যদি বিদ্রোহ সফল
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব,
কিন্তু সাবধান,
ফিরিঙ্গীরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান।" *

রঙ্গালয়ে জাতীয়ভাব সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয় ১৮৭৩

*গিরিশচন্দ্রের জাতীয়তামূলক নাটকের বিস্তারিত বিবরণ 'গিরিশ প্রতিভা"য় লিখিত আছে।

খৃষ্টাব্দে। উক্ত বৎসরের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ বিরচিত 'ভারতমাতা' নামক একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় হয় ; এই নাটকে শিশিরকুমার বলিতেছেন :

"ভ্রাতৃগণ অনৈক্য, আত্মাভিমান, ও স্বজাতি হিংসাই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যত দিন তোমাদের অন্তর হ'তে এ সব ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে একতার আশ্রয় গ্রহণ করো ও কায়মনবাক্যে জননীর দুঃখনাশ ব্রতে ব্রতী হও—

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল
ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে
কি ভয়, কি ভয় ?"

ইহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'পুরু-বিক্রম' নাটকে লেখেন :

"উঠ জাগ বীরগণ ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভুমি কর ত্রাণ
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥

স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক তারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক্ প্রাণ যাক্ স্বাধীনতা বেঁচে থাক্
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তরবার
ঐ শোন, ঐ শোন যবনের রব॥
এইবার বীরগণ. কর সবে দৃঢ় পণ
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন।
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন॥"*

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি মূরের অনুসরণে বলেন ঃ-

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়!
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

* কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "জোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি" নামক গ্রন্থে তাঁহার বিস্তারিত জীবনী লিখিত আছে।

কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
অতএব রণ-ভূমে চল ত্বরা যাই হে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাহি হে
তুল্য তার নাই॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে
এসো সব ভাই॥"*

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে এই জাতি-বৈর ভাব হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা উপাসনার মঙ্গলঘট তিনিই সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন।"

রঙ্গলালের পর কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত' আবার সমগ্র বঙ্গদেশে নিনাদিত হইয়া উঠিল।

* ইহা ১২৬৫ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ রচিত "রঙ্গলাল" পুস্তকে কবির জীবনী লিখিত আছে।

"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
আরব্য মিশর পারস্য তুরকী
তাতার তিব্বত অন্য কব কি
চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

ইহার পরেই কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় গাহিলেন :

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদয় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহু লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" *

* ১২৮৩ সালের "আর্য্যদর্শন" পত্রে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

দুর্গাদাস নাটকে দেশকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গ্রামবাসী-গণকে ওজস্বিনী ভাষায় উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছেন—"ওঠো সৈনিকগণ ঔদাসিন্য পরিত্যাগ করো একবার দৃঢ়পণ করে ওঠো—ওঠো যেমন ডমরুধ্বনি শুনে সর্প ফণা বিস্তার করে ওঠে, যেমন বজ্রধ্বনি শুনে পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে, যেমন ঝঞ্ঝার নিষ্পেষণে সমুদ্রের তরঙ্গে কল্লোল ওঠে। ভারতবর্ষ জানুক বিদেশী জানুক—তোমাদের শৌর্য্য গুপ্ত ছিল মাত্র, লুপ্ত হয়নি।"

অন্যত্র তিনি আবার দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গাহিতেছেন :

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহিত মেষ
দেবী আমার ! সাধনা আমার !
স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ
ত্রিংশ কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন আমার দেশ।"

বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ যখন তাঁহাদের রচনার মধ্য দিয়া দেশের মধ্যে জাতীয়তা প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় এই

দেশে একদল ইংরাজী শিক্ষিত অনুকরণকারীর উদ্ভব হয়। তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য, বঙ্গদেশে আর একজন মহামানবের আবির্ভাব হইল—তিনি হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

তিনি তূর্য্যনাদে ঘোষণা করিলেন—"হে ভারত এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাস সুলভ দুর্ব্বলতা ......এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?"

সহিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে আবার তিনি বলিলেন—"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা—কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে তাকে.. দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে।...... ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহ্কালেও নরকভোগ পরকালেও তাই। এইটি শাস্ত্রের কথা। গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় সহ্য করা পাপ তৎক্ষণাৎ প্রতি-বিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

এই পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাঙ্গলার বালক, কিশোর, তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় যখন বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, সেই সময় ভারতে ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপস্থিত হয়।

ইংরাজগণ তখন মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষ আমাদের

বিজিত দেশ, তরবারির সাহায্যে যখন আমরা ইহা লাভ করিয়াছি, তখন তরবাবির সহায়তায় ইহাকে রক্ষা করিব। এই দেশবাসীর আবার ভারতবর্ষে অধিকার কি? তাহারা দাস বই তো আর কিছুই নয়। লর্ড এলেনবরা (Lord Ellenborough) লর্ড সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন :

"Our very existence depended upon the exclusion of the native from the military and political power. We have won the Empire by the sword and we preserve it by the same means."

ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ্য পণ্ড হইলেও, তাহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল গেল যে, ইংরাজগণ ভারতবাসীকে, প্রকৃত ক্ষমতার ভগ্নাংশও দিতে রাজী নহেন। ইহা হইতে বাঙ্গালীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিক্ষালাভ করিলেন আর বুঝিলেন বঙ্কিমচন্দ্র "আমাদের পলিটিক্স" বিষয়ে 'কমলাকান্তের পত্রে' ভিক্ষানীতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। দেশবাসী সেই সময় বুঝিলেন যে, পলিটিক্স দুই জাতীয়—বৃষ জাতীয় ও কুকুর জাতীয়। জোর করিয়া আদায় করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই, ভিক্ষার দ্বারা কিছুই হইবেনা, ইহাই চুড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রও বৃষ জাতীয় পলিটিক্স গ্রহণ ও আত্মনির্ভরশীল হইতে দেশবাসীগণকে নির্দ্দেশ দেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"শিবু কলুর পৌত্র দশম বর্ষীয় বালক এক কাঁসী ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকায় কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুন্নমনে জিহ্বা নিক্ষৃত করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুকুর চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অন্ন পরিপূরিত বদন প্রতি আড় নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলু-পুত্র একখানা মাচের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বন, লেহন, গেলন এবং হজম করণে প্রবৃত্ত হইল।

অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিল। বোধ হয় বলিতেছে—হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই এক মুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। আর কুক্কুরও সুখে অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে কলু-গৃহিনী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে

একটা কুক্কুর ম্যাক ম্যাক করিয়া ভাত খাইতেছে দেখিয়া কলু-পত্নী রোষ কষায়িত লোচনে এক ইষ্টক খণ্ড লইয়া কুক্কুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্ব্বক বহুবিধ রাগরাগিনী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এদিকে এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া জোর করিয়া জাবনা খাইয়া গেল বংশদণ্ডের ভয়েও একপদ সরিল না। কলু-পত্নীর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; অবশেষে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর বৃষ অবকাশমতে জাবনা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে ছুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।”

এইভাবে বিভিন্ন সাহিত্যের ধারায় বাঙ্গালী জাতির হৃদয় বিপ্লববাদে প্রস্তুত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য ব্যতীত নবগোপাল মিত্র প্রবর্ত্তিত ‘হিন্দু মেলা’র মধ্যেও স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত হয়। হিন্দু জাতিকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে প্রবুদ্ধ করা, ইহার উদ্দেশ্য হইলেও, দেশীয় ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম এবং কৃষি শিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি এই মেলায় প্রদর্শিত হইত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই হিন্দু মেলাতেই সর্ব্ব-প্রথম “জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর” উদ্বোধন হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে দেশে স্বদেশজাত দ্রব্যাদির প্রচলনের উদ্দেশ্যে ইহা

প্রবর্ত্তিত হইলেও, মেলা উপলক্ষে জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত এবং প্রবন্ধাদিও পাঠ করা হইত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"যে হিন্দু মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।"

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত কবিতাটি হিন্দু মেলায় পঠিত হইয়াছিল :

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান।
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান ?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন।

*　　　*　　　*

মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ?
ঐ দেখ কাঁদিতেছেন জননী বিহ্বলা,
গুমরিয়া কত কাল থাকিবে অবলা ?"

যাহা হউক, আবেদন-নিবেদন বা ভিক্ষানীতিতে কোন কাজ হইবেনা, ইহা যখন বেশ বুঝা গেল, ঠিক সেই সময়েতে বাঙ্গলার কয়েকজন তরুণ নূতন পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতিহাসে তাহার সন্ধানও পাওয়া গেল ; ইটালি, পোল্যাণ্ড,

আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে যে সমস্ত কারণে বিপ্লব বাদীদের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গদেশেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? পরাধীন দেশে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়া উঠিলে, পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গুপ্ত-সমিতির আবির্ভাব যে অনিবার্য্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দেশবাসীর প্রতিবাদ অবজ্ঞা করিয়া বঙ্গ-দেশকে বিভক্ত করায় আত্মনির্ভরতা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল এবং বঙ্গবাসীগণ মাতৃহারার ন্যায় "বন্দেমাতরম" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল; বাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল:

"শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্ব্বলেরো
হওনা কেন যতই বড়
আছেন ভগবান।
ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান
তোমাদের এমন অভিমান?"

পূর্ব্ব-বঙ্গের গভর্ণর হইলেন ফুলার সাহেব, তিনি ভেদ-নীতিতে অভ্যস্ত—সুযোগ বুঝিয়া তিনি মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের

উপর যথারীতি অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার হইল না।*

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনায় কি অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা আজও স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হিন্দু বিধবার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। কুমারী কন্যা হরণের দায়ে, পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ কর্ত্তৃপক্ষের শরণ লইলেও, প্রতিকার হইত না। মুসলমান মোল্লারা লাল ইস্তাহার বাহির করিত। তাহাতে হিন্দু বিধবা ও কুমারী কন্যাদিগকে হয় বিবাহ, নয় নিকা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু শূন্য করিবার সঙ্কেত দেওয়া হইত। বিধবার উপর অত্যাচার করিয়া বিচারালয়ে অপরাধীর আড়াই টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে কুমারী কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার বিচারালয়ে প্রমাণিত হইলেও, পাঁচ টাকার অধিক অপরাধী দণ্ড পায় নাই।†

বাঙ্গলার সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইতিপূর্ব্বেই বিপ্লবের পরিবেষ্টন সৃষ্টি হইয়াছিল; তারপর এই সমস্ত সরকারী অত্যাচারে বৃটিশ শাসন পরিবর্ত্তনের জন্যই, বঙ্গের স্থানে স্থানে গুপ্ত

---

* ইংরাজগণ কি ভাবে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াইয়াছিলেন; তাহা মল্লিখিত "নয়া বাঙ্গলা" নামক পুস্তকে বিশদভাবে লিখিত আছে।

† স্বদেশী যুগের স্মৃতি—শ্রীমতিলাল রায়।

সভা সমিতির জন্ম হইল। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গ-বিভাগের জন্যই বাঙ্গলায় বিপ্লববাদের যে প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আজ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগোই এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "আবেদন নিবেদন দ্বারা ভাঙ্গা বাঙ্গলা যখন যোড়া লাগল না, তখন আবেদন নিবেদন নীতির উপর যাঁদের বিশ্বাস আর থাকল না, তাঁরা চরমপন্থী নামে অভিহিত হলেন এই চরমপন্থীদের ভিতর থেকে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির চেষ্টায় আর একটি ক্ষুদ্র দল বেড়ে উঠতে লাগল। এই দলের নাম বিপ্লবপন্থী অর্থাৎ ভারতীয় বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উচ্ছেদপ্রয়াসী।......স্বদেশী ভাবটা কেবল হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মুসলমানগণ সরকারের পক্ষ নিয়েছিলেন, আর অনেক স্থলে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন। কাজেই মুসলমান বিদ্বেষ হিন্দুদের মধ্যে আরও বেড়ে উঠেছিল। এ দেখেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রতি নেতাদের চিন্তা আকৃষ্ট হয়নি। তখন ইহার সমাধানের চেষ্টা দূরের কথা ছিল, বরং ক্রমে এই সমস্ত আন্দোলনটা এ দেশে হিন্দুজাতীর প্রাধান্য বিস্তারের আন্দোলনে পরিণত হ'তে যাচ্ছিল। মুসলমান-গণও এর প্রতিবাদ স্বরূপ হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির উপর অত্যাচার সুরু করেছিলেন। বিপ্লববাদের কাজ আরম্ভ হবার ঠিক আগে দেশের এই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল।"

দুই

বংশপরিচয় ও বাল্যকাহিনী

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমী তিথিতে কানাইলাল দত্তের জন্ম হয়; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণাষ্টমীর দুর্য্যোগ রজনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, যেমন সেই দিনটি হিন্দুদের নিকট পবিত্র পুণ্য দিন, কানাইলালও ব্রজেশ্বরীর গর্ভে উক্ত পুণ্য দিনে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া, সেই দিনটিও ভারতবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কানাইলালের পিতার নাম স্বর্গীয় চুনীলাল দত্ত; তাঁহার আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে হইলেও, কানাই তাঁহার মাতুলালয় চন্দননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। কানাইলালেরা দুই ভাই এবং সাত জন বোন; জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নাম শ্রীযুত আশুতোষ দত্ত, তিনি আজও জীবিত আছেন এবং বোনেদের মধ্যে তিনজন গতায়ু হইয়াছেন।

জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্ম হয় বলিয়া, বাঙ্গালীর নামের অনুপ্রাস-প্রীতির জন্য আশুতোষের ভায়ের নাম সর্ব্বতোষ রাখা হয়; কিন্তু 'সর্ব্বতোষ' অত বড় নাম ধরিয়া ডাকিবার অসুবিধার জন্য বাল্যকালে তাঁহাকে সকলে 'কানাই' বলিয়া ডাকিতেন এবং এই নামেই তিনি চিরস্মরণীয় হন।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রবীন ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি কানাইলালকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করেন। 'পঞ্চানন্দ' আজ পরলোকে যাইলেও আমাদের কানাইলাল, তাঁহার কৃত কর্ম্মের জন্য আজ দেশবাসীর নিকট পূজিত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার সেই কথা এখন স্মরণ হইতেছে। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

"দ্বাপরে কানাই ছিল
নন্দের নন্দন—
কলিতে তাঁতীর কুলে
দিল দরশন ;
তাহারে ছলিয়াছিল
অক্রুর গোঁসাই
গোঁসাইকে কানাই দিল
বৃন্দাবনে ঠাঁই।
গোঁসাই হল গুলিখোর
কানাই নিল ফাঁসী,
কোন চোখে বা কাঁদি বল
কোন চোখে বা হাসি।"

বাঙ্গলাদেশে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবন যেমন অনাড়ম্বর ভাবে কাটিয়া যায়, কানাইলালের জীবনও

ঠিক সেই ভাবে কাটিয়াছিল। চুনীবাবু বোম্বায়েতে সরকারী চাকুরী করিতেন; জাহাজ বিভাগের একজন হিসাব রক্ষক ছিলেন এবং অবস্থাও তাহার খুব ভাল ছিল না। সেইজন্য দারিদ্রের মধ্যেই তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

চার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতার সহিত তিনি পিতার কর্ম্মস্থল বোম্বাইয়ে চলিয়া যান এবং নয় বৎসরের সময় চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বোম্বাইয়ে 'আর্য্য হাই স্কুলে' কানাইলালের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং তাহার বিনম্র ব্যবহারে ও লেখাপড়ার ঝোক দেখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং বহু পুস্তকাদি তাহাকে উপহার দিতেন। চন্দননগরে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া কানাই পুনরায় বোম্বাই চলিয়া যান এবং প্রায় পনের বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই শহরেই লেখপড়া করেন। সেই সময় আর্ট স্কুলেও তিনি কিছুদিন পড়িয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চন্দননগরে ফিরিয়া আসেন এবং স্থানীয় ডুপ্লে কলেজ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি উক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তিনি ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের বিশেষ প্রিয় পাত্র হন এবং তাঁহার প্রভাবেই কানাইলাল একপ্রকার বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কানাইলালের সৌজন্যতায় ও শিষ্ট ব্যবহারে চারুবাবু তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন এবং ইতিহাস ও অর্থনীতি যত্ন সহকারে পড়াইতেন এবং তদ্বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বহু আলোচনা হইত।

কানাইলাল বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হইবার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাহার অধ্যাপক বলিয়া চারুবাবুকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে "আমাদের বাগানে একখানা নোটবুকে একটা নাম লেখা ছিল—চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। খুলনার ইন্দুভূষণকে আমরা চারু বলিয়া ডাকিতাম। পুলিশ তাহা না জানিয়া চারুচন্দ্র রায় চৌধুরীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে স্থির করিল যে চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ই, ঐ চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। চারুবাবুর বোধহয় অপরাধ যে কানাইলাল দত্ত ও আমি উভয়েই তাহার ছাত্র ও উভয়েরই বাড়ী চন্দননগর। যাঁহার ছাত্রেরা এমন রাজদ্রোহী, তিনি 'রায়'ই হোন, আর 'রায় চৌধুরী'ই হোন তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাঁহাকে ত ধরিতেই হইবে।"

কানাই মুড়ি এবং দুগ্ধ বিশেষ ভালবাসিতেন; তাহার বাল্যজীবন একপ্রকার প্রবাসেই কাটিয়াছিল বলিয়া, মহিষের দুগ্ধ তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং তিনি প্রতিদিন দু-সের আড়াই সের করিয়া মহিষের দুগ্ধ পান করিতেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।

মুড়ির সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিলে, কানাইলাল হাঁসিয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেন ঃ

"ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি,
আসি এই বঙ্গভূমি
উদ্ধারিছ বঙ্গবাসীজন।
কাঙ্গাল বিষয়ী যত
সদা তব অনুগত
কভু হর তাপসের মন।
মুড়ি ভোজী পেলে লঙ্কা
স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা
শঙ্কা করে সদা তারে যম।
আদার তরে হলে যোগ
অমৃতে আদিত্য ভোগ
কলার সঙ্গে নাহি কিছু কম।"

কানাইলাল আহার ও পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ উদাসীন থাকিতেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সহিত মেলামেশা করিবার আগ্রহ, তাহার খুব দেখিতে পাওয়া যাইত।

ডুপ্লে কলেজ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পাশ করিয়া তিনি হুগলী কলেজে ইতিহাসে অনার্স লইয়া বি-এ পড়িতে

আরম্ভ করেন। গান বাজনা, ঘুড়ি ওড়ান, মুষ্টি যুদ্ধ এবং গঠনমূলক কার্য্যের জন্য সমিতি গঠন করা কানাইয়ের বিশেষ প্রিয় ছিল।

কানাইলালের জীবনীকার শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় লিখিয়াছেন যে "অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, কানাইলাল চন্দননগরে পাঁচ ছয়টী সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। মূল কেন্দ্র ছিল, তাহার নিজ বাটিতেই। সেখানে রীতিমত ব্যায়াম চর্চ্চা চলিত, বিশেষভাবে লাঠি খেলার ধূম পড়িয়াছিল। মার্ত্তাজা নামক এক ব্যক্তির নিকট সে লাঠি খেলায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া ভদ্রলোকের ছেলেরা লাঠি খেলায় আগাইয়াছে দেখিয়া অনেক বাগ্দী জাতীয় লোকেরা সমিতিতে আসিয়া লাঠি খেলা শিক্ষা দিত। সকল শ্রেণীর লোক লইয়াই সমিতিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে বিপ্লবের কোন সংস্রব আছে, তাহা কানাইয়ের আচরণে বুঝা যাইত না; তবে ইহার মধ্যে তার যে একটা সুদূর কিছু লক্ষ্য আছে তাহা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু আসল ব্যাপারটা অবস্থা বুঝিয়া সে এমন ভাবে চাপা দিত যে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের আর অবসর থাকিত না।"

কানাইলালকে দেখিতে লম্বা ও তাহার বর্ণ ছিল শ্যামবর্ণ; স্বাস্থ্য তাহার মোটামুটি ভালই ছিল, তবে চন্দননগরে থাকা-কালীন ম্যালেরিয়া জ্বরে, তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া যায়।

তাঁহার আয়ত চক্ষুদ্বয় তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত এবং বাহির হইতে তাহাকে শান্ত-শিষ্ট বলিয়া মনে হইলেও, অন্তরটি তাহার খুব দৃঢ় ছিল। মিথ্যা কথা তিনি পছন্দ করিতেন না এবং মাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের নিকট তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না; সেই জন্য তিনি যখন চাকুরী করিবার নাম করিয়া কলিকাতায় বিপ্লবদলে যোগ দিয়া ধরা পড়েন, তখন তাহার মাতা সে কথা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। কারণ কানাইলাল তাঁহার অগোচরে কোন কাজ করিতে পারে না, ইহাই তাহার ধারণা ছিল।

কানাইলালের চন্দননগরের বাড়ির পার্শ্বে কয়েক জন বারবণিতা বাস করিত বলিয়া প্রতি রাত্রেই ঐ স্থানে কোন না কোন একটা গোলমাল হইত। সেই জন্য পাড়ার লোকের নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইত; কিন্তু সাহস করিয়া কেহই কোন কথা বলিত না! এক রাত্রে চটকলের কয়েকজন সাহেব মদ্যপান করিয়া পূর্বোক্ত নারীগণের সহিত বিকট চিৎকার ও নৃত্য করিতেছিল। সাহেব বলিয়া কেহই তাহাদের বারণ করিতে অগ্রসর হয় নাই। কানাইলাল তাহাদের আচরণে খুব বিরক্ত হন এবং বাটী হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে চিৎকার করিতে নিষেধ করেন। তাহারা দলে তিন জন ছিল ও কানাইয়ের কথায় ভ্রুক্ষেপ করার আবশ্যক বোধ করিল না। সাহেবদের দলে একজনের ছিল কানায়ের দ্বিগুণ চেহারা;

কানাইলাল সর্বাগ্রে ঐ সাহেবের নাকে সজোরে এক ঘুঁসি মারিতেই, সাহেব কয়েক পাক ঘুরিয়া নর্দ্দমায় পড়িয়া গেল। অন্য দুইজন ব্যাপার সুবিধা নয় দেখিয়া, পালাইবার উপক্রম করিতেই, কালাইলাল একজনকে ধরিয়া রগে এমন এক ঘুঁষি লাগাইল, যে সেও ধরাশায়ী হইল। অন্যজন পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। বলা বাহুল্য তাহার পর হইতে আর ঐ স্থানে কাহাকেও গোলমাল করিতে শুনা যায় নাই

যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় জাতীয় সাহিত্য বাঙ্গলার মাটিকে এরূপ উর্ব্বর করিয়া দিল, যে বাঙ্গালী যুবক বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নব ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলি বেদবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্র কার্য্য করিত। স্বামীজি বঙ্গযুবকগণের উদ্দেশ্যে বলেন— "বঙ্গযুবক বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ। বিশ্বাস করো তোমরা অপরীসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমার মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম।" কানাইলালও স্বামীজীর একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন।

কানাইলাল নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী ও নিরহঙ্কারী ছিলেন। চন্দননগরের ছোট বড় সমস্ত অনুষ্ঠানেই তিনি যোগদান করিতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বার্ণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দ যখন ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ত্যাগ করে, তখন কানাইলাল

চারুচন্দ্র রায়কে কেন্দ্র করিয়া দরিদ্র কেরাণী কুলের সাহায্যের জন্য একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেন। "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী, আর কি তারা সজীব আছে" এই কথাটি যে বাঙ্গালীদের পক্ষে খাটে না, বার্ণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তাহাই প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন বলিয়াই, কানাইলাল তাহাদের সাহায্যার্থে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হন।

ইহার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত সেবা ধর্ম্ম এই নীতি অনুযায়ী, কানাইলাল স্নানার্থীদের সেবা ও সাহায্য করিবার জন্য ত্রিবেণী সঙ্গমে 'সেবক-সঙ্ঘ' গঠন করেন। পরে অর্দ্ধোদয় যোগে উক্ত সেবক সঙ্ঘ চন্দন-নগরেও সেবা কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

শ্রীমতিলাল রায় লিখিয়াছেন যে, চন্দননগরে একবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ যখন আমাদের কানে পৌঁছিল, তাহার কিছু পূর্ব্বে, কানাইলালকে প্রায় ১০৫ ডিক্রি জ্বরে বিছানায় বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছি; কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কানাইলাল সেই উৎকট জ্বর লইয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দগ্ধমুখে, চালের মটকায় দাঁড়াইয়া পরমোৎসাহে জল ঢালিতেছে। প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা বহু লোকের অসাধারণ পরিশ্রমের পর অগ্নি মন্দতেজ হইয়া আসিলে কানাইলাল নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া বসিয়া

পড়িল, তারপর আমাদের কাঁধের উপর ভর দিয়া বাটি আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। দেশের দুঃখে সে জীবনের সুখসোয়াস্তি কোনকালেই ভ্রুক্ষেপ করিত না।

সম্ভবতঃ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতি হইতেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'যুগান্তর' কাগজ প্রকাশিত হয়। যুগান্তরের জ্বালাময়ী প্রবন্ধ সেই সময় বঙ্গযুবকগণকে বিশেষ ভাবে উদ্দীপিত করিত।

বাঙ্গলায় বিপ্লব আন্দোলনের সহিত স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার পি, মিত্র), স্বর্গীয় যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি উপাধ্যায় বলিয়া খ্যাত) এবং শ্রী শ্রী-অরবিন্দের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যতীন বাবু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পি, মিত্রের সহায়তায় আপার সার্কুলার রোডে একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমথবাবু দেখিতে অত্যন্ত কাল ছিলেন এবং তিনি যখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান, সেই সময় তাঁহার বর্ণের জন্য, বহু স্থানে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তিনি গর্ব্বিত ইংরাজদিগের বর্ণ বৈষম্যের কথা, কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই এবং কলিকাতায় আসিয়া সেইজন্য তিনি বিপ্লববাদে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করেন। যতীন-বাবু বরোদার মহারাজার সামরিক বিভাগে ছিলেন পরে উক্ত কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদায় গায়কোবার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন; বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে যখন সমস্ত দেশ আলোড়িত, সেইসময় তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যোগদান করেন। যতীন বাবু কর্ত্তৃক সমিতি প্রতিষ্ঠার ছয়মাস পরে, বারীন্দ্রবাবু তাহাদের সহিত যোগদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "অরবিন্দের কাছে আমি দীক্ষা নিয়ে এই কেন্দ্রে এসে যোগদান করি।"

বাঙ্গলার তরুণগণ যে সময় নূতন পথের সন্ধান করিতেছিল ঠিক সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের "Bandemataram," বিপিনচন্দ্র পালের "New India", শ্রীদেবব্রত বসুর "যুগান্তর" ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" নূতন বার্ত্তা লইয়া আবির্ভাব হইল। বাঙ্গালী জাতি যেন অকস্মাৎ দীর্ঘ নিদ্রাশেষে জাগিয়া উঠিল, বাঙ্গলার মরা নদী যেন ভীষণ বানে প্লাবিত হইয়া গেল। অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলী গঠন করিয়াছেন এবং তূর্য্যনাদে ঘোষণা করিতেছেন—"We want absolute autonomy free from British Control" আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালীদের 'ফিরিঙ্গীর ফেন-চাটা'র নিন্দা করিতেছেন এবং পথে পথে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতারম্' সঙ্গীত গান করিয়া তরুণেরা বলিতেছেন—

"মাগো যায় যেন জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ বলে"

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের 'Bandemataram' পত্রে 'অগ্নিমন্ত্রের' যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা নিম্নের কয়েক লাইন হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

"Nationalism means two things—(i) The self consecration to the gospel of national freedom. (ii) The practice of Independence......

Let us then calculate the day—let it be the reconsecration of the whole Bengal to the new spirit and the new life, a purification of heart and mind to make it an undivided possession and the consecrated temple and habitation of the Mother. And secondly, let it be a calm, brave, and masculine re-affirmation of our independent existence."

কলিকাতায় মাণিকতলা অঞ্চলে ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে অরবিন্দ বাবুর পিতা, স্বর্গীয় কৃষ্ণদয়াল ঘোষের একটি বাগান-বাড়ী ছিল ; শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ উক্ত বাগান, গুপ্ত সমিতির

কার্য্যের জন্য, দলীল সম্পাদন করিয়া কিনিয়া লন। রাজনৈতিক শিক্ষা দান এবং শরীর চর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বন্দুক ছোড়া ইত্যাদি কার্য্যের জন্য এই নির্জ্জন নিরালা স্থানটি নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই এই সমিতির অন্যতম স্তম্ভ বিশেষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। তিনি আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার ছিলেন এবং মেদিনীপুর কলেজে সহকারীর কার্য্য করিতেন। গুপ্ত সমিতির সভ্য হইয়া তিনি, ফ্রান্সে যান এবং তথা হইতে বোমা তৈয়ারী ও বিস্ফোরক-বিদ্যা শিখিয়া, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া আসেন।

সমিতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক সভ্যকে নিরামিষাশী হইতে হইত। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে কানাইলাল কলিকাতায় বিপ্লব সমিতির খবর লইতে আসেন; চন্দননগরের শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পূর্ব্ব হইতেই কানাইয়ের পরিচয় ছিল, কারণ তাহার ভ্রাতা শ্রীআশুতোষ দত্তের সহিত উপেন্দ্র বাবু একসঙ্গে ডুপ্লে কলেজে পড়িতেন। সেই বৎসর কানাইলাল বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, তিনি সমিতির সভ্য হইয়া মাণিক-তলার বাগানে থাকিয়া যান। উপেন্দ্র বাবু তাহাকে বি-এ পরীক্ষার পর আসিয়া দেখা করিতে বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়া ফিরাইয়া দেন।

বিপ্লবী দলে নূতন কোন সভ্য ভর্ত্তির জন্য আসিলে, তাহারা

প্রথমে নানা অজুহাতে, তাহাদিগকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন। যাহারা দৃঢ় প্রকৃতির যুবক, তাহারা পুনরায় আসিলে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইত।

সমিতিতে প্রথম আগমন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি কানাইলাল একবার কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করে। মাণিকতলার বাগানের কথা সে জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা যে, বাগানে আসিয়া ভর্ত্তি হয়। সেবার কানাইলালের বি-এ পরীক্ষা দিবার কথা। আমি বলিলাম—'পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে আসিও।' নূতন ছেলে আসিলে ঐরূপ একটা অজুহাতে অনেক সময় ফিরাইয়া দিতাম। কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইত। যাহার নিতান্ত প্রাণের জ্বালা ধরিয়াছে সেই আবার ফিরিয়া আসিত।"

অগ্নেয়গিরির গৈরিক-স্রাব যতদিন না উদ্গীরণ হয়, ততদিন আগ্নেয়গিরির আচরণ দেখিয়া তাহা যে কিরূপ, তাহার স্বরূপ কেহ ঠিক বুঝিতে পারে না। তেমনি তখন সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন সভায় যে সকল আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা দেখিয়া তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, বঙ্গদেশে আবার এক নূতন দলের উদ্ভব হইয়াছে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই দলের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় যখন মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে ছোটলাট যে ট্রেণে

আসিতেছিলেন, সেই ট্রেণটি উল্টাইবার জন্য বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কারণ গাড়ী চলিয়া যাইবার পর বোমাটি ফাটে। ইহাতে দেশে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইলেও ইংরাজ সরকারের সুযোগ্য পুলিশবৃন্দ কয়েকজন নিরীহ কুলিকে ট্রেণ উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়া বাহাদুরী লন। কুলীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

ইহার পূর্ব্বে আরো কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বরিশালে ছোটলাট ফুলার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা ও রঙ্গপুরেও অনুরূপ একটি চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। ছোটলাট স্যার এনড্রু ফ্রেজারের গাড়ি উল্টাইবার জন্য চন্দননগরে দুইবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়।

গোয়ালন্দে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর, এলেন নামক একজন ইংরাজের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহাও কোন পারিবারিক ঘটনার ফল বলিয়া, পুলিশ তাহাকে ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বলিয়াছেন যে, "নারায়ণ-গড়ে ছোটলাটের গাড়ী বোমার আঘাতে উড়াইয়া দিবার আয়োজন যেমন মানুষের প্রাণে উত্তেজনার সৃষ্টি করিত, সেইরূপ কুমিল্লায় মুসলমান অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর হস্তে অগ্নি নালিকার ভীম গর্জ্জনও মানুষকে পাগল করিয়া তুলিত। তখন ঘা খাইয়া নীরব থাকাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সে

যুগে ঢিলের বদলে পাটকেল ছোঁড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বিবরণে প্রতিদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভ ভরিয়া যাইত। উত্তেজনার অবধি থাকিত না, মরণপথে ঠেলাঠেলি পড়িয়া যাইত।

কানাইলাল বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ইহার আশা ও উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। পড়াশুনায় আর তেমন মনোযোগ দিতে পারিল না, সর্ব্বতোভাবে আপনাকে এই কার্য্যে টানিয়া দিল। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্ন স্বর্ণজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ সিংহ ইহার অন্তরায় স্বরূপ কিরূপ বীরদর্পে থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে, সে দিকটা তখন আমলেই আসিত না, যেন একটা প্রবল স্রোতে গা ভাসান দিতে পারিলেই, মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগিত, স্বপ্ন হউক, তবুও তাতে সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের সময় চন্দননগরে "ওয়ারেন্স সার্কাস" (Warrens Circus) নামক একটি বিদেশী কোম্পানী সার্কাস দেখাইতে আসে। এই কোম্পানী ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের বসিবার স্থানে একটি প্রভেদ রাখিয়াছিল বলিয়া চন্দননগরে খুব আন্দোলন হয়। অধিকন্তু বিলাতী কোম্পানী দরিদ্র দেশবাসীর অর্থগুলি সার্কাসের ছুতা করিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাও তরুণেরা তখন বিশেষ পছন্দ করেন নাই। তখন বিলাতী দ্রব্য বয়কট সুরু হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কানাইলাল কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া উক্ত সাকার্সের টিকিট

ঘরের সম্মুখে যাইয়া, সার্কাস দর্শনার্থীদের টিকিট ক্রয় করিতে নিষেধ করিতে থাকেন।

কানাইলালের এই কার্য্যে সার্কাসের সাহেব ম্যানেজার আসিয়া, উহা করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু কানাইলাল তাহার কথায় কর্ণপাত না করায়, উভয়ের মধ্যে ভীষণ তর্ক উপস্থিত হয়। সাহেবের একজন শ্বেতাঙ্গ সহকারী তাহার মনিবের সহিত একজন কালা-বাঙ্গালী এইরূপ ভাবে সমানে অন্যায় করিয়া আবার তর্ক করিতেছে দেখিয়া, হঠাৎ কানাইলালকে একটি লাঠি লইয়া আক্রমণ করে। কানাই সাহেবের লাঠি এড়াইয়া তাহার মুখে এরূপ একটি ঘুঁষি মারেন, যে সাহেব দশপাক ঘুরিয়া, একটি খুঁটির উপর পড়িয়া আহত হয় এবং তাহাকে হাঁসপাতোলে পাঠাইতে হয়। এই ব্যাপার লইয়া চন্দননগরে মহা গোলমাল হয় এবং সার্কাস কোম্পানী পরে চন্দননগর হইতে চলিয়া যায়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল বি-এ পরীক্ষা দেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের তৎকালীন অবস্থার জন্য, তিনি পড়াশুনা কিছুই করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু ইংরাজ বিতাড়নের জন্য, তাহার মন বদ্ধপরিকর এবং সেইজন্য পড়া ছাড়িয়া বিপ্লবী দলে ভর্তি হইবার জন্য, কয়েকবার যুগান্তর কার্য্যালয়ে ঘুরিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, নানা কারণে তাহার পড়া কিছুই হয় নাই এবং

সকলেই ভাবিয়াছিল যে, কানাই পরীক্ষা দিতে পারিবে না। পরীক্ষার মাত্র এক মাস পূর্ব্বে কানাইলাল পড়া আরম্ভ করেন এবং সসম্মানে বি-এ পাশ করেন। কিন্তু পরে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার জন্য, তাহার ডিক্রি কাড়িয়া লওয়া হয়।

তাহার পড়াশুনার সম্বন্ধে মতিবাবু লিখিয়াছেন "কানাই পড়াশুনা খুব কম করিত। প্রতি বৎসর পরীক্ষার সময় পাইচারি করিতে করিতে পাঠ্যপুস্তকগুলি একবার করিয়া উল্টা-ইয়া যাইত,কিন্তু তাহাতেই সে ক্লাসের মধ্যে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। বি-এ পরীক্ষার সময়ে এইরূপ আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। ঠিক পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি লইয়া, সে কেবল পাতা উল্টাইয়া গিয়াছিল, আমরা নিশ্চয় ভাবিয়াছিলাম, কানাই এবার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, কিন্তু যথাকালে পাশের খবর পাইয়া বিস্মিত হইলাম এবং তাহার প্রতিভাকে ধন্যবাদ দিলাম।'

কানাইয়ের বাল্যজীবনে দারিদ্র প্রীতি, দরিদ্র বালক-গণের সহিত অসাধারণ সৌহৃদ্য স্থাপনে অনুরাগ, পরোপকার প্রভৃতি সদগুণের সহিত তাহার একটি বিশেষ গুণ ছিল—সেটি সত্য নিষ্ঠা। কানাই বিনয়ী ছিল অসাধারণ, পিতামাতার মুখের উপর চক্ষু চাহিয়া সে কখনও কথা কহে নাই; কিন্তু কোথাও সত্যের অপলাপ হইলে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত, সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। মুখ দিয়া তার কখনও মিথ্যা কথা বাহির হয় নাই।"

—তিন—

কানাই ও বিপ্লব সমিতি

মুরারীপুকুর বাগানের গুপ্ত সমিতিতে শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগোই, স্বর্গীয় দেবব্রত বসু, স্বর্গীয় হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি থাকিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে এই বাগানে সমিতির উদ্বোধন হয় এবং উপেনবাবু তখন এই কেন্দ্রের কর্ত্তা ছিলেন। বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য যাহারা এই স্থানে আসিতেন, তাহাদিগকে দুইটি বিভাগে ভাগ করা হইত। যাঁরা ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী তাঁহারা একটি বিভাগে এবং যাঁহারা ধর্ম্ম বিশেষ পছন্দ করিতেন না, অথচ বৈপ্লবিক কর্ম্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে একটি দলে রাখা হইত। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা এই বাগানে থাকিতেন এবং উপেন্দ্রবাবুর কাছে রাজনীতি, ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। বলা বাহুল্য ইহারাই প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

উপেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে এই বাগানে বিপ্লবীগণ থাকিতেন; তিনি এই বাগান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল :

মানিকতলার বাগানে যখন আশ্রমের সূত্রপাত হইল, তখন সেখানে চার পাচ জনের অধিক ছেলে ছিল না। হাতে একটিও পয়সা নাই, ছেলেরা সকলেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাদের মা বাপদের কাছ থেকেও কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ ছেলেদের আর কিছু জুটুক আর নাই জুটুক, দুবেলা দু মুটো ভাত ত চাই। দু একজন বন্ধু মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন আর স্থির হইল যে, বাগানে শাক সব্জীর ক্ষেত করিয়া বাকি খরচটা উঠাইয়া লওয়া হইবে। বাগানে আম, জাম, কাঁটালের গাছও যথেষ্ট ছিল। সে গুলো জমা দিয়াও কোন না দু-দশ টাকা পাওয়া যাইবে? আর আমাদের খাইতেও বেশী খরচ নয়—ভাতের উপর ডাল, আর একটা তরকারী। অধিকাংশ দিনই আবার ডালের মধ্যেই দুই চারিটা আলু ফেলিয়া দিয়া তরকারীর অভাব পুরাইয়া লওয়া হইত। সময়াভাব হইলে খিচুড়ীর ব্যবস্থা। একটা মস্ত সুবিধা হইল এই যে, বারীন তখন ঘোরতর ব্রহ্মচারী। মাছের আঁশ বা পেঁয়াজের খোসাটি পর্যন্ত বাগানে ঢুকিবার হুকুম নাই; তেল, লঙ্কা একবারেই নিষিদ্ধ। সুতরাং বাগানের খরচ কতকটা কমিয়া গেল।

যে সমস্ত সভ্যের ধর্ম্মের প্রতি তত মন ছিল না তাহা-দিগকে অন্য স্থানে রাখা হইত। মানিকতলার বাগানে ক্রমশঃ বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় কুড়ি জন সভ্য

বাস করিতেন। ইতিপূর্ব্বে কানাইলাল কয়েকবার এই স্থান ঘুরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে নানা অজুহাতে পরীক্ষা না দেওয়া হইলে, থাকা হইবেনা, বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অবশেষে বি-এ পরীক্ষা দিয়া পুনরায় কানাইলাল বাগানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি সঙ্গে আবার একটি বন্ধুকে লইয়া আসিয়াছিলেন।

কানাইলাল যে সময় এই স্থানে আসেন, সেই সময় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বত্র ছিল; সেই জন্য উপেনবাবু কানাইলাল ও তাহার বন্ধুকে চন্দননগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন এবং আশা দেন যে, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবেন, কারণ পুলিশ বাগানের সকল সভ্যকে ধরিয়া দলটিকে একেবারে নির্ম্মুল করিয়া দিবে, ইহা তাহার ইচ্ছা নয়।

কানাইলাল বারীন্দ্রবাবুকে ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন যে তাহাকে দলে রাখিতেই হইবে। তিনি আর চন্দননগরে ফিরিয়া যাইবেন না। বারীন্দ্রবাবু সম্মত হন এবং কানাইও দলে ঢুকিয়া পড়িলেন। তাহার বন্ধুটি ফিরিয়া যান।

কানাইয়ের বৈপ্লবিক কর্ম্মে আন্তরিক নিষ্ঠা থাকিলেও, ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ মন ছিল না, সেই জন্য তিন চার দিনের মধ্যেই তাহাকে চট্টগ্রামে একটি কারখানায় কুলীদের সহিত কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কানাইয়ের চশমা থাকার জন্য কুলি সাজিয়া কার্য্য করিবার

তাহার বিশেষ অসুবিধা হয়, সেই জন্য অল্পকয়েক দিনের পরই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাকে বোমা তৈয়ারী করা শিখিবার জন্য, গোপীমোহন দত্ত লেনে সমিতির অন্য একটি কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রে কানাইলাল ইন্দুভূষণ রায়, নিরাপদ (ওরফে নির্ম্মল) রায় প্রভৃতি থাকিতেন এবং ফ্রান্স হইতে প্রত্যাগত হেমচন্দ্র কানুনগোই তাহাদিগকে বোমা তৈয়ারী প্রণালী শিখাইয়া যাইতেন। এই সম্বন্ধে হেমবাবু লিখিয়াছেন যে "কানাই নিজে ত নাক টিপতই না অন্যের নাক টিপাও দেখতে পারত না" অর্থাৎ বাগানে ধর্ম্ম-চর্চ্চা বা প্রাণায়াম করা ভাল লাগিত না বলিয়াই তাহাকে বোমা তৈয়ারীর কারখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিয়াছেন যে "কানাই আমাদের মধ্যে আসে আমরা চাঁপাতলায় যুগান্তর অফিসে থাকিতে, কিন্তু তখন সে বড় রুগ্ন, ম্যালেরিয়ায় বড় ভুগিতেছিল। তাই আমরা শরীর সুস্থ করিবার জন্য তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে পুরী পাঠাই। কানাই ছিল রোগা, ঢ্যাঙা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ আয়ত চক্ষু ও ধীর।

আমরা সবাই ছিলাম অল্প বিস্তর বাচাল এক কানাই বাদে ; সেই ছিল আমাদের মধ্যে নীরব, অ-দরকারে সে বড় একটা কথা কহিত না। ক্রমাগতই সে আমার কাছে একটা

প্রাণ মন ভরা কাজ চাহিত, আমি তখন সবে বাগানে আড্ডা ফাঁদিবার সংকল্পে আছি, হঠাৎ ফর্ম্মাস মাফিক কাজ তখন দিই কোথা হইতে! মানুষটিও নিতান্ত জরাজীর্ণ, নিত্যই একবার করিয়া সেই বাঙ্গালীর দোসর ম্যালেরিয়া অসুরের কবলস্থ হয়। তাই আমরা তাহাকে আগে শরীরটা সুস্থ করিবার বরাত দিয়া পুরী পাঠাইলাম, সেও নিমরাজি হইয়া অপ্রসন্ন চিত্তে চলিয়া গেল। পুরী হইতে আসিয়া সে সবে গোয়াবাগানের বাসায় ছিল, মনের মত কাজ তখনও পায় নাই তখন সেও জানিত না এবং আমিও জানিতাম না যে, তাহার মনের মত কাজ সে পাইবে।”

মুরারীপুকুর কেন্দ্রের নির্দ্দেশানুসারে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল কুমার চাকী নামক দুইজন তরুণ সভ্যের উপর মজঃফরপুরের দায়রা ও সেসান জজ কিংসফোর্ড সাহেবকে বোমার দ্বারা হত্যা করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। কারণ এই সাহেবটি কলিকাতায় চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন ‘যুগান্তর’, ‘বন্দেমাতরম্’, ‘সন্ধ্যা’ প্রভৃতি কাগজগুলির মোকর্দ্দমায় যে ভাবের বিচার করেন, তাহাতে জনসাধারণ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং সুশীল সেন নামক একটি কিশোরকে বেত্র-দণ্ডে দণ্ডিত করায় বঙ্গ যুবকগণ বিচলিত হইয়া উঠেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে, কিংসফোর্ডের বাংলোর নিকট একটি ঘোড়ার গাড়ি লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হয়

এবং গাড়ির আরোহিনী মিসেস কেনেডী নামক একটি মেমসাহেব ও তাহার কন্যা বোমার দ্বারা নিহত হন।

বোমা নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী পলাইয়া যায়। পরদিন ১লা মে মজঃফরপুর হইতে পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত ওয়েনী রেলওয়ে ষ্টেশনের বাহিরে এক মুদীর দোকানে ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রফুল্লকুমার চাকীকে নন্দলাল ব্যানার্জ্জি নামক একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পর দিন ১লা মে তারিখে, মোকামাঘাট ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি নিজের রিভলভার দিয়া কণ্ঠনালীতে ও মস্তকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করেন। নন্দলাল ব্যানার্জ্জিকে সরকার হইতে সেইজন্য ১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু ৯ই নভেম্বর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। প্রফুল্লবাবু পুলিশের হস্তে ধরা দেওয়া অপেক্ষা, নিজ হস্তে নিজ জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদের সম্মান লাভ করেন।*

মজঃফরপুরে মিঃ করণ ডাফের এজলাসে ক্ষুদিরাম বসুর বিচার হয় এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। ১৯০৮

* প্রফুল্লকুমার চাকীর নিবাস উত্তর বঙ্গে, বগুড়া জেলায়; তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় নিরোদচন্দ্র চাকী এবং মাতার নাম স্বর্গতা স্বর্ণময়ী দেবী। তাঁহারা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ মল্লিখিত "মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয় গান গাহিয়া, ক্ষুদিরাম ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে নূতন গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তোলেন। ক্ষুদিরামের আত্মদান বাঙ্গালার হৃদয়ে নূতন ভাবের বন্যা বহাইয়া দেয় এবং তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় শহীদের সম্মান লাভ করেন।*

কোন এক অজ্ঞাত কবি ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর যে গানটি রচনা করেন, তাহা বাঙ্গলাদেশের পথে ঘাটে বাউল ও ভিক্ষুক-দের কণ্ঠে বহু বর্ষ যাবৎ শ্রুত হইয়াছিল। এই গানটী হইতে সাধারণের হৃদয়ে, তিনি যে কিরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গানটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

আমায় এবার বিদায় দে মা,
ঘুরে আসি।
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী॥
ওমা, মাটির বোমা তৈরী করে
বসেছিলাম লাইনের ধারে।

* ক্ষুদিরাম বসুর নিবাস মেদিনীপুর জেলায়; তাঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতার নাম স্বর্গতা লক্ষীপ্রিয়া দেবী। মল্লিখিত "মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরাম" নামক পুস্তকে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী লিখিত আছে।

জজ ম'লো না, বিফল হোল
ম'লো তুই নির্দ্দোষী ॥
ওমা, শনিবার দিন বেলা দু'টোতে
লোক ধরে না কোর্টেতে।
অভিরাম যায় দ্বীপ-চালানে মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ॥
ওমা দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে।
চিনতে যদি না পার মা
দেখবে গলায় ফাঁসি ॥*

মজঃফরপুরের ঘটনার পর মুরারীপুকুর কেন্দ্র, ২রা মে তারিখে খানাতল্লাসী করা হয় এবং এই স্থান হইতে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সভ্য গ্রেপ্তার হন। কানাইলাল সেই সময় ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনে থাকিতেন, পুলিশ ঐ দিন এই বাড়িটিও ঘেরাও করে এবং কানালাল ও শান্তিপুরের নিরাপদ রায় এই স্থানে ধৃত হন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীও এই দলে ছিলেন এবং

* এই প্রকারের আরো বহু গান তৎকালে রচিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে তিনি রঙ্গপুর ও বাঁকুড়ায় দুইটি ডাকাতির চেষ্টা, চন্দননগরের মেয়রের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা প্রভৃতি কয়েকটি বৈপ্লবিক কর্ম্মে অংশ গ্রহণ করেন।

বারীন্দ্রবাবু প্রভৃতির সহিত তিনিও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৪ঠা মে তারিখে বিপ্লব সমিতির আমূল ইতিহাস কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট স্বীকার করিয়া পরিশেষে বলেন—"I persuade them all to give written statement to Ramsadai Mukhejee, because I believe that as this plan was found out it was destined not to do any other work in connection with national freedom." তাঁহার এই বিবৃতিতে সভ্যগণের মধ্যে অবসাদ আসিয়াছিল, কিন্তু কেন যে তিনি বিবৃতি দেন তাহা প্রনিধান যোগ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাহারা কি করিতেছিলেন; তাহা দেশবাসীকে জানাইবার জন্যই বারীন্দ্রবাবু স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন্। সুতরাং উহা যে উচ্চভাব প্রণোদিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বারীন্দ্রবাবুর স্বীকারোক্তিতে একটি অলৌকিক 'বই-বোমা'র (Book-Bomb) কথা প্রকাশ পায়। মার্চ্চ মাসে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য একটি মোটা বইয়ের মধ্যে তাহার পাতাগুলি গোল করিয়া কাটিয়া বাহির করিয়া, তন্মধ্যে

একটি বোমা ঢুকাইয়া, তাঁহার বাড়িতে কাগজে মুড়িয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পুস্তকখানি পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি মজঃফরপুরে বদলীর হুকুম পান বলিয়া উক্ত পুস্তকখানি আর খুলিয়া পড়িবার সময় পান নাই। মজঃফরপুরে গিয়া উহা পড়িবার মানসে, তিনি অন্যান্য পুস্তকের সহিত 'বই-বোমা'টিকেও বাক্স বন্দী করিয়া পাঠাইয়া দেন।

প্যাকিং বাক্সের মধ্যে অন্যান্য পুস্তকের সহিত এই 'বই-বোমা' সযত্নে মজঃফরপুরে রক্ষিত হইয়াছিল। বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির পর, পুলিশ কমিশ্যানার হ্যালিডে সাহেব বিপ্লবী-গানের কার্য্যাবলী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান এবং মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড সাহেবকে 'তার' করিয়া উক্ত প্যাকিং বাক্সে হাত দিতে নিষেধ করিয়া দেন। বোমাটিকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ মিঃ এলারসন সাহেবকে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন এবং তিনি বাক্সটিকে বহুক্ষণ জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া 'বই-বোমা'র সক্রিয়তা নষ্ট করিয়া দেন। সম্প্রতি কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে অগ্নিযুগের যে সমস্ত বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুস্তকের মধ্যে প্রোথিত এই 'বই-বোমা' অন্যতম।*

* আনন্দবাজার পত্রিকায় এই 'বই-বোমা'র আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মতে পুলিশ "অনেক নির্দ্দোষী লোককে ধরিয়াছে ; অন্ততঃ তাঁহাদের বাঁচাইবার জন্য আমরা বিবৃতি দিব।" কিন্তু কানাই পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি ত দূরের কথা, তাহার নিজের নাম ধাম পর্য্যন্ত বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

এই স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের অভিমত যে, "বিপ্লব-সাধন সম্ভাবনায় হতাশ হইয়া দারুণ মনোভঙ্গের ফলেই খুব সম্ভব তিনি (বারীন্দ্র) ধরা পড়িয়াই, পুলিশের নিকট অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলেন ; অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা বারীন্দ্রকুমার যদি আত্মকথা ব্যক্ত না করিতেন, নরেন্দ্রনাথের পক্ষে রাজসাক্ষী হওয়া হয়তো ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার চিত্রিত কঙ্কালের উপর রঙ ফলাইয়াই নরেন্দ্রনাথ দেশের ঘোরতর অনিষ্টসাধনে সুযোগ পাইয়াছিল ; কিন্তু আবার এ কখনও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, বিপ্লবযজ্ঞের পুরোহিতের মুখে মুক্তিসাধনার এই অলৌকিক কাহিনী অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল বলিয়াই, স্বাধীনতা প্রয়াসী তরুণদের জীবনে অমৃতের মত, ইহা অপূর্ব্ব বলবিধানে ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিয়াছিল।"

ইহাদের স্বীকারোক্তিতে, তাঁহারা বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলভার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই, এইরূপ কার্য্য করিতে ছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু ২৩শে জুন নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

নিজে মুক্ত হইবার জন্য, রাজসাক্ষী (Approver) হইয়া সাক্ষীর মঞ্চ হইতে যেদিন সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিল, সেইদিন তাহার দেশদ্রোহীতা দেখিয়া, সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ উপর্য্যুপরি পাঁচদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য দেন এবং অবলীলাক্রমে অরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক, বারীন্দ্র ঘোষ, সত্যেন বসু, দেবব্রত বসু প্রভৃতিকে ইহার সহিত সুন্দরভাবে জড়াইয়া দেন।

নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির পর, অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় দেবব্রত বসু, নিখিলকৃষ্ণ রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, হৃষিকেশ দাস বিনয় ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্র বসু, এবং যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধৃত করিয়া আনা হয়। নরেনের স্বীকারোক্তিতে আলীপুর জেলের মধ্যে কেহই ঘাবড়াইয়া যান নাই; বরং যে দিন তিনি প্রথম রাজসাক্ষী হন, সেই দিন হইতে তাহাদের আমোদ প্রমোদের মাত্রাও বাড়িয়া যায়। কোর্টে তাহারা যাবতীয় ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করিয়া, রাত্রে সেইগুলি অভিনয়ের ন্যায় এরূপ সুন্দরভাবে পুনরাবৃত্তি করিতেন যে, প্রত্যেকই তাহাতে বিশেষ ভাবে আনন্দ উপভোগ করিতেন। জেল হইতে কোর্টে যাইবার সময় সকালবেলা তাহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে বাসে উঠিতেন এবং বৈকালবেলা ফিরিবার কালে, প্রত্যেকে সমস্বরে প্রসিদ্ধ ফরাসী সঙ্গীতের উর্দ্দু পদ্যানুবাদ গান করিতে করিতে ফিরিতেন। তাঁহাদের এইরূপ

উল্লাস দেখিয়া প্রত্যেকেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইত। ফরাসী সঙ্গীতের পদ্যানুবাদ এইরূপ ছিল :

"দিন পর জুলুম হোতা জঙ্গী জোয়ান
ভাই জলদি লও হাতিয়ার।..."

অর্থাৎ দিনের পর দিন অত্যাচার ও জুলুম বাড়িয়া যাইতেছে অতএব ভাই সব যত শীঘ্র পার তোমাদের হাতিয়ার লইয়া প্রস্তুত হও।

নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির মধ্যে বহু মিথ্যা ঘটনা ছিল কারণ পুলিশ তাহাকে যে ভাবে নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সেই ভাবেই তিনি ঘটনাগুলি বিবৃত করেন। পুলিশ তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, এইরূপ ভাবে বলিলে তিনি নিস্কৃতি পাইবেন এবং নরেন্দ্রও স্থির করিয়াছিলেন যে, নিষ্কৃতি পাইলে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্র সহ বিলাতে যাইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিবেন। রাজসাক্ষী হওয়ায় দেশের লোকের তাহার উপর যে, কিরূপ মনোভাব হইয়াছিল তাহা তিনিও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বহু নিরীহ ও বোমার সহিত সম্পর্কহীন ব্যক্তিকেও পুলিশ এই মামলায় যে জড়িতে করিয়াছিল তাহা উপেন্দ্রবাবুর কথা হইতেই প্রতীয়মান হয়। তিনি বলিয়াছেন যে জেলে গিয়া, তুই দিন বিশ্রাম করিতে না করিতেই দেখি পণ্ডিত হৃষিকেশ তাহার বিশাল দেহভার দোলাইতে দোলাইতে সেখানে আসিয়া

উপস্থিত ; তাহার সহিত মানিকতলার বাঁগানের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। আমাদের কার্য্য কলাপের কিছু কিছু সে জানিত মাত্র। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণও ছিল না। বাগানের কাগজ পত্রের মধ্যে দু এক জায়গায় তাহার নাম জানিয়া পুলিশ সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল। পুলিশ যখন তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া হাজির করে, তখন তাহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে মত গোল গাল নাদুস নুদুস চেহারা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ দেখিয়াই বন্ধুর আমার মেজাজটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। মহামান্য সরকার বাহাদূরের রাজ্য ও শাসন নীতি সম্বন্ধে বন্ধু আমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর এখানে পুনরুদ্ধৃত করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে বিপদে পড়িবার ইচ্ছা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহের টম-ফুলারির (Tom foolery) আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া লাঠ মর্লীর পিতৃ শ্রদ্ধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে সবই ছিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জেলের মধ্যে এক পৃথক কঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া তাহার রাজনৈতিক মতামতের সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া হাজির হইলেন শ্রীমান দেবব্রত। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি "যুগান্তরের" সহিত সম্বন্ধ পরি-

ত্যাগ করিয়া “নবশক্তির” সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। “নবশক্তি” উঠিয়া যাওয়ার পর, তিনি আপনার সাধন ভজন লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা দেখাশুনা করিতেন না।

যাহা হউক জেলের মধ্যে অভিনয়, গান-বাজনা, ধর্ম্মালোচনা কিছুই বাদ যাইত না। রাত্রের আমোদ প্রমোদে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, স্বর্গীয় দেবব্রত বসু ও শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ব্যতীত প্রত্যেকেই যোগ দিতেন। শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই, শ্রীউল্লাসকর দত্ত এবং দেবব্রত বসু খুব সুন্দর গান করিতে পারিতেন কিন্তু দেবব্রতবাবু বড় গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া, তাহাকে দিয়া গান করান বড় শক্ত হইত।

উপেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্ত-চিত্র প্রত্যেকের চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিত। তাহার রচিত একটি গানের কয়েক পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

“উঠিয়া দাঁড়াল জননী
কোটী কোটী সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল !

*　　　*　　　*

রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিমা চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি
বীর রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল।”

জেলের মধ্যে আনন্দ উৎসবের যেমন অভাব ছিল না, ঝগড়া মারামারির তেমনি অভাব ছিল না। ধর্ম্ম কর্ম্ম শ্রীঅরবিন্দ ও দেবব্রত যেমন সুন্দরভাবে করিতেন তেমনি অন্যান্যকে তাঁহারা বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা দিতেন। কিন্তু কানাইলালের এই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাল লাগিত না এবং ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি সময় সময়ে তিনি চুরী করিয়া রাখিতেন এবং একবার কাহার একখানি গীতাও নাকি তিনি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কেবল স্বামী বিবেকানন্দের "কর্ম্মযোগ" বইখানিকে তিনি পড়িতে বড় ভালবাসিতেন।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই 'বাঙ্গলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, জেলের মধ্যে অন্য দিকে ঝগড়া ঝাটী, মারা-মারি, দলাদলি গালাগালি আবার কোলাকুলি, ঢলাললিরও অভাব ছিল না। তার উপর ধর্ম্মপ্রচার, সাধন ভজন, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভগবদ্দর্শন উপলব্ধি, সমাধি ইত্যাদিও ছিল।

কানাইলালের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, তাঁহার আত্ম-কাহিনীতে লিখিয়াছেন—"জেলে আসিয়া তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়া এক রকম আগে হইতেই জীবনে ইস্তফা দিয়া সে বলিয়াছিল—'বিশ বছর জেল আর যেই খাটুক আমি খাটছি নে, তার অনেক আগেই আমি নিজের ছুটি করে নেব।'

কানাইলাল কি ধাতুর তৈরী বস্তু তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝি

নাই। সে আমাদের মধ্যে নূতন কর্ম্মী, তখনও তাহার কোন পরীক্ষাই হয় নাই ; নূতন মানুষ কাজের কাজী না হওয়া অবধি আমাদের কাছে আমলেই আসিত না। শেষে যখন সে বিপদের কাল বৈশাখীর দিনে আপন শক্তি পরীক্ষা আপনি দিল, তখন তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে ; আমবা যক্ষপুরীর মাঝে জীবনের অ াঁধার নিশাতে চিনিলাম শুধু হারাইতে।”

কানাইলাল প্রভৃতি ত্রেত্রিশ জন ২রা হইতে ৪ঠা মে তারিখের মধ্যে ধৃত হন এবং নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির পর দেবব্রত বসু প্রভৃতি আট জন ধৃত হন। আলিপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লি মামলার ‘প্রাথমিক অনুসন্ধান’ করিয়াছিলেন এবং সাক্ষী প্রমাণ লইবার পর ১৯শে অক্টোবর হইতে আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ ব্রীচক্রফটের এজলাসে মোকদ্দমা আরম্ভ হয় এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে এই ঐতিহাসিক মামলার রায় প্রকাশ হয়। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রথমে আসামী পক্ষ সমর্থন করেন, পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে ইহা পরিচালনা করেন।

এই মামলা সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—“যাঁহাদের অল্প দক্ষিণায় পোষাইল না তাঁহারা দুই চারি দিন পরেই সরিয়া পড়িলেন ; শেষে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া আমাদের মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন।”

নরেন্দ্রনাথ ২৩শে জুন হইতে মিঃ বার্লির আদালতে রাজার সাক্ষী হিসাবে উপর্যুপরি পাঁচ দিন সাক্ষ্য দেন। নরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যে প্রত্যেকেই যে ক্ষুব্ধ হইতেছেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষও বেশ বুঝিতে পারেন এবং সেই জন্য তাহাকে সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত করিয়া আদালতে আনা হইত। জেলের ভিতর চলাফেরা করিবার জন্য লিণ্টন ও হিগিনস্ নামক দুইজন শ্বেতাঙ্গ কয়েদী সর্ব্বসময় তাহার দেহরক্ষী হিসাবে থাকিত। কানাইলাল ও অন্যান্য আসামীদের সহিত নরেন থাকিত না, তাহাকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে রাখা হইয়াছিল।

—চার—

নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজ সাক্ষী হইয়া যে স্বীকারোক্তি করেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ বিবৃত হইল ঃ

আমার নাম শ্রীনরেন্দ্রনাথ গোস্বামী; আমরা শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী বংশের লোক। আমার পিতার নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী। আমাদের কিছু জমিদারী আছে। জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে প্রায়ই বাঁকুড়া, হাঁসডাঙ্গা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় যাইতে হইত। বর্ত্তমানে আমার বয়স ৩০ বৎসর।

আমি ছেলে বেলায় হেয়ার স্কুলে ও হিন্দু স্কুলে পড়িতাম, এবং পরে সেণ্ট জেভিয়ারর্স কলেজে পড়িয়াছি। জমিদারী দেখিবার জন্য আমাকে আগেই পড়া ছাড়িতে হয়।

একবার বাঁকুড়ায় আমাদের জমিদারীতে যাইবার পরে রামদাস নামে একব্যক্তি আমাদের বাড়ী আসেন। আমাদের সেখানকার উকীল নগেন্দ্র দত্ত পরিচয় করাইয়া দেন এবং স্বদেশী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি আমাকে বলেন "আমাদের এখানে একজন বিশিষ্ট নেতা আছেন, তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজের শাসন ধ্বংস করিয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা

করাই তাহার উদ্দেশ্য।” তাঁহাকে আমার দেখিবার আগ্রহ হইল। দুই একদিন পরে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সন্ন্যাসীর বেশে, এক প্রবীণ ব্যক্তি আমার কাছে আসেন। তিনি গীতা, পরলোকতত্ত্ব, আত্মা প্রভৃতির কথা বলেন, তাঁহার কথায় আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়। তিনি দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করা যে উচিৎ তাহা বুঝাইয়াছিলেন। দুই চারিদিন পরে তিনি আমাকে একখানি পত্র দিয়া, কলিকাতায় বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। পরে শুনিয়াছি যতীন্দ্রবাবু আগে বরোদায় থাকিতেন। আমি কলিকাতা ফিরিয়া প্রথমে উপেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে ও পরে অরবিন্দবাবুর সহিত দেখা করিতে যাই।

উপেন্দ্রবাবু যুগান্তরের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া আমাকে বলেন, “ভাই যুগান্তর অফিসে একদিন যেও, সব কথা হবে।” তিনি আমাকে গ্রাহক হইতে বলেন ; আমি তখনই দেড় টাকা দিয়া যুগান্তরের গ্রাহক হই।

বারীনবাবুর সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি দেশ যাহাতে স্বাধীন হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে কথা বলিলেন। তিনি বলেন “দেখুন আমাদের নিজেদের লোক ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে বিজ্ঞান শিখিবার জন্য যাইবে। টাকা যত বেশী পাওয়া যাইবে, কাজ আমাদের তত বেশী হইবে।”

আমি বলিলাম—বিজ্ঞানের আবশ্যকতা কি? তিনি বলিলেন “বোমা তৈয়ারী শিখিয়া আসিবে, ট্রেন উড়াইবার

কৌশল বুঝিতে পারিবে, আর এখন হইতেই যুবকদিগকে শিখাইতে হইবে যে, যখন যুদ্ধ বাধিবে, তখন যেন শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের ঠিক ভাবে মারা যাইতে পারে।" একটু পরে বলেন "তুমি যদি বিদেশে যাও, বেশ ভাল হয়।"

তদুত্তরে আমি বলি যে, পরে বুঝিয়া বলিব।

বারীনবাবু বলিলেন "দেখুন সেজদা (অরবিন্দবাবু) কত বড় পণ্ডিত, তিনি দেশ স্বাধীন করিবার জন্যইতো বরদা হইতে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ''সকল বিষয়ের নেতা কে? আপনি ?"

তিনি বলিলেন 'না, না, আমি কেন হইব। সেজদাই (শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ) নেতা।"

অরবিন্দবাবু মুরারীপুকুরের উদ্যানেও আসিতেন, যুগান্তর অফিসেও যাইতেন, আর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধ মল্লিকের বাড়ীও যাইতেন! সেখানে তিনি কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন। সব জায়গাতেই অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হইত। সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে অবিনাশ চক্রবর্ত্তী আসিতেন। তিনি একজন মুনসেফ। তাঁহার সঙ্গেও দেশের কথা হইত। আর একজন ব্যক্তি আসিতেন তাহার নাম নীরদবাবু, ইনি সুবোধবাবুর সম্পর্কে ভাই হইতেন।

সুবোধবাবু যুগান্তরের জন্য ৫০০৲ টাকা দেন। যুগান্তর

লাইব্রেরীতে 'মুক্তি কোন পথে', 'বর্ত্তমান রণনীতি', 'রুষ-জাপান যুদ্ধ', 'ভবানী মন্দির', 'আনন্দমঠ', 'গীতা' প্রভৃতি পুস্তক থাকিত। 'ভবানী মন্দিরে' বোমার ব্যবহার কিরূপ হইবে, সাহেবদিগকে কি করিয়া হত্যা করা যাইতে পারে প্রভৃতি সবকথা আছে। এই সব বই সমিতির সভ্যরা পড়িত। উল্লাসকর দত্ত বিস্ফোরণ যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন।

সমিতিতে ছোরা, গুলি, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি সকলে অভ্যাস করিতেন। কিছুদিন পরে বারীনবাবু আমাকে বলেন, "হেমবাবু বোমা তৈয়ারী শিখিবার জন্য ফ্রান্সে চলিরা গিয়াছেন।" মিঃ টি, এম, বাপাতও বোমা তৈয়ার করিতেন। ইহা ছাড়া সমিতিতে ধর্ম্মশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও দেহ চর্চ্চার শিক্ষা দেওয়া হইত।

সুবোধবাবু ও অরবিন্দবাবুর মধ্যে খুব সম্প্রীতি ছিল! চারু দত্ত, কি মিত্র ঠিক মনে নাই, তিনি ছিলেন সুবোধবাবুর ভগ্নিপতি। তিনি একজন সরকারী সিভিলিয়ান। তিনি একদিন যুগান্তর প্রেসে আসিয়া বলেন, "স্বরাজ স্থাপন কর্ত্তেই হবে, মারহাট্টারা যেমন করে টাকা উঠায়, আমরা তেমনি ক'রে টাকা ওঠাব।" ঠাকুরবাড়ীর শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমিতিতে আসিতেন। আর মনোরঞ্জ গুহ-ঠাকুরতা গিরিডিতে থাকেন। তিনিও সমিতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সেখানে একটী জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমিতির কাজে তিনি ৩০০০৲ দিয়াছিলেন।

উদ্যানে উপেন্দ্রবাবু সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন, তিনি গীতা পড়াইতেন। শচীন্দ্র সেনের মত অল্পবয়স্ক ছেলেরা তাঁহার গীতার উপদেশ শুনিতে বড় ভালবাসিত। শচীনের বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। ১৩।১৪ বছরের ছেলে মাত্র। এত অল্পবয়সের আর কোন ছেলে ছিল না। উপেন্দ্রবাবু যেমন বাঙ্গলা, তেমনি ইংরাজী জানেন। তাঁহার গীতার বাখ্যায়, দারোগা দীনবন্ধুবাবু পর্য্যন্ত মুগ্ধ হন।

উদ্যানের বিপ্লব সমিতিতে একটা বাক্‌সে টাকা থাকিত। সেখান হইতে বারীনবাবু, উপেনবাবু, পরেশ মৌলিক ও প্রফুল্ল চাকী ইচ্ছামত টাকা লইতেন। বন্দুক এবং বিস্ফোরক জিনিষ কিনিবার জন্য টাকার দরকার হইত। আমি একদিন উপেনবাবুকে স্বচক্ষে পঞ্চাশ টাকা নিতে দেখিলাম। বারীন-বাবুর একটা খৃষ্টানী নাম আছে—ইমান্নুয়েল। বোধ হয় সমুদ্র পৃষ্ঠে জাহাজে জন্ম হওয়ার জন্য। তবে তিনি খুব ভাল বাঙলা বলিতে পারেন। উদ্যানে গীতার কথা, শরীর চর্চ্চার কথা, বিস্ফোরক জিনিষের কথা এবং সমিতির কার্য্য কিরূপ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইত। বরদার কৃষ্ণজী পাণ্ডেও সমিতিতে আসিতেন।

বালগঙ্গাধর তিলক কিরূপভাবে শিবাজী ও গণপতি উৎসব করিয়া লোকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহাও বলা হইত। পুনায় প্লেগের পরে অত্যাচার নিবারণের জন্য কি করা

হইয়াছিল তাহাও সমিতিতে আলোচনা হইত। উদ্যানে অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশে থাকিত। আমিও সন্ন্যাসীর বেশ পরিতাম। লোকে বলিত আমার চেহারা বেশ সুন্দর। অনেকে আমাকে সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিত। হেমদাসবাবু, যিনি বোমা তৈয়ার করা শিখিয়া আসিয়াছেন, তিনি একজন জমিদারের পিস্‌তুত ভাই তাঁর বাড়ীতে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উল্লাসকর দত্ত আসিত। মিঃ বাপাত এবং আব্বাস মির্জ্জাও ফ্রান্সে বোমা তৈয়ারী করা শিখিয়াছেন।

একদিন অরবিন্দবাবু আমায় বলেন, "নরেন এই বারোটা টাকা নিয়ে তুমি রংপুরে যাও, সেখানে এক বিধবার বাড়ীতে ডাকাতি ক'রে টাকা আন্‌তে হবে। ঈশান চক্রবর্ত্তী নামে সেখানে আমাদের একজন বিশ্বস্ত লোক আছেন ; তার কাছে গেলেই, তিনি তোমায় সাহায্য করবেন।"

আমি টাকা লইয়া রংপুর চলিয়া যাই। আমার সঙ্গে রিভলভার ছিল। আমার পূর্ব্বেই প্রফুল্ল চাকী চলিয়া গিয়াছিল। আমি, হেমদাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী, পরেশ মৌলিক ঐ দলে ছিলাম। প্রফুল্ল চাকী আর পরেশ আমাদের গাইডের কার্য্য করে।

সেখানে প্রথমে আমরা বলিহার জমিদারের কাছারীতে যাই। ঈশান চক্রবর্ত্তী ও তার ছেলে মনোরথ আমাদিগকে

সাহায্য করে। মনোরথও একজন জমিদার। আমার চশমটা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমি যে রিভলভারটি নিয়াছিলাম, তাহা অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের। কিন্তু মনোরথ রাত্রে আমাদিগকে খবর দেয় যে, গ্রামে পুলিশ আসিয়াছে, বোধ হয় পূর্ব্বে কোন রকমে তাহারা সংবাদ পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের সঙ্কল্প আর সিদ্ধ হয় নাই। আমরা চলিয়া আসিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া আমি অরবিন্দবাবুকে সব কথা বলি, তিনি উত্তর করেন "একবার না হইয়াছে, তাহাতে চিন্তা কি, আবার হইবে।"

অতঃপর বাঁকুড়ায় যাই। আমাকে সেখানে পাঠানো হয়। সেখানে হইতে অম্বিকা নগরের রাজা রাইরচণ ধবল আমাকে নিয়া পুরুলিয়ায় আসেন। সেখানে তাঁহার একটি ফিতার কারখানা ছিল। সেখান হইতে হাসডাঙ্গা যাই। স্থির হয় যে রাত্রে মোহান্তের বাড়ী লুট করিব। মোহান্তের অনেক টাকা আছে। আমাদের সঙ্গে রিভলভার এবং লাঠি ছিল। বীরেন্দ্র, আমি, নিরাপদ ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। রাজার দারোবান প্যালারাম সময় বুঝিয়া আমাদিগকে খবর দিবে, এই কথা ছিল। কিন্তু সেই লোকটা এত মদ খাইয়াছিল যে, আমাদের কাজ হয় নাই। বাঁকুড়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করিলাম।

ছোটলাট সাহেবে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার হাওড়া হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। আমাকে আদেশ দেওয়া হয় যে আমি আগে গিয়া রেল লাইনের উপরে বোমা রাখিয়া আসিব। আমি লাট সাহেবের গাড়ী উড়াইবার কাজে ছিলাম। আমি, বারীন বিভূতি, উল্লাসকর আমরা চন্দননগর গিয়াছিলাম। আমি প্রথমে শ্রীরামপুরে যাই ও বারীন তারপরে চন্দননগর যায়। প্রায় সন্ধ্যার সময় সেখানে পৌঁছি। এইটা দেওয়ালীর সময়ে হইয়াছিল (১৯০৭ নভেম্বর) এবার বোমাটা ফাটে নাই। আমরা শরৎ ঘোষের বাড়ী চন্দননগরে ছিলাম। বোমাটি একটা লোহার গ্লাসের মতন, আর তাহার উপর চাকতি ছিল। আমার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি ছিল। আমি, বারীন, উল্লাস কর ও প্রফুল্ল চাকী সেই দলে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে শান্তি ঘোষও ছিল।

ইহার তিন চারি দিন পরে, আবার আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমি আর একটি বোমা লইয়া যাই। এবার বোমাটা গ্লাসের মত লোহার একটা গোল বস্তু ছিল। প্রথমে মানকুণ্ডে ট্রেনে যাই। সেখান হইতে হাঁটিয়া সন্ধ্যায় যাই গন্তব্যস্থলে, পরে কাজ সারিয়া গঙ্গা পার হইয়া ট্রেনে শ্যাম-নগর হইতে শিয়ালদহ পৌঁছি।

নারায়ণগড়ে যে সাহেবের গাড়ী উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহাতে আমি ছিলাম না। কিন্তু বারীন, উল্লাসকর

প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। একথা বারীনই আমাকে বলিয়াছেন। সেই সময়ে আমি কাশীতে ছিলাম; সুবোধ মল্লিকও সেখানে ছিলেন। নারায়ণগড়ের কথা তাঁর সঙ্গে আমার হয় কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় তিনি দুঃখিত হন। তবে আমি যখন বিদায় নিয়া আসি তখন তিনি বলেন—

"বারীনকে আমার ধন্যবাদ দিবে"। আমি কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলেন 'অনেক দিন থেকে চেষ্টা তো চলছে; যদিও ফল হয়নি, তবু ধন্যবাদ তার প্রাপ্য"।

আমি ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে এই কথা বলিলে, তিনিও বলেন "হাঁ, একবার হয়নি, আবার হবে"।

চন্দননগরে আরেকটা ব্যাপার হয়। সেখানে যে মেয়র আছেন, তাঁহার ডিনারে যাওয়ার সময়ে, তাঁহার উপরে বোমা মারিবার কথা হয়। তিনি নাকি ইতিপূর্ব্বে স্বদেশী সভা পুলিশের সাহায্যে বন্ধ করেন, তাই সব নেতারাই তাঁকে জীবিত রাখা পছন্দ করে না।

আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র দাসের বাড়ী যাই। আমি বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি যে "মেয়রকে মেরে লাভ কি?"

বারীন উত্তর করে "দেখ, টাকার দরকার, মেয়রকে খুন করিলে অনেক জমিদার আমাদের দলে আস্‌বে।"

আমি বলি চন্দননগরে এমন জমিদার কে আছেন?

বারীন বলেন "কেন উত্তরপাড়ার জমিদারবাবুরা রয়েছেন, মিত্রীবাবুতো এর মধ্যেই ২০০৲ দিয়ে সাহায্য করেছেন, আরও হাজার টাকা পাওয়া যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মিত্রীবাবু কে?"

বারীন বলেন—"কেন জানোনা, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জির জ্যেষ্ঠপুত্র?"

আমরা যখন চন্দননগরে পৌঁছি তখন সন্ধ্যাকাল। চারুবাবু তখন গঙ্গার ধারে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের দলের চন্দননগর এলাকার বিশিষ্ট নেতা। আমরা একটু দূরে ছিলাম, একটি ছেলে আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন। ছেলেটী অল্প বয়স্ক, নাম নরেন। আসিয়া বলে "চারুবাবু চান মেয়রকে দুনিয়া থেকে সরাইতেই হবে"। আমারা মেয়রের বাড়ীর দিকে গিয়া পার্শ্বের একটি গলিতে অপেক্ষা করি। আমরা মানকুণ্ড পর্য্যন্ত ট্রেনে আসিয়া সেখান হইতে দুই মাইল হাঁটিয়া চন্দননগর যাই। হেমদাস, নিরাপদ রায়, উল্লাসকর দত্ত ও ইন্দুভূষণ রায়, বারীন, বিভূতি ও আমি ছিলাম। হেমবাবুর বাড়ী হইতে আমরা তিনটা বোমা ও একটী ক্যানভাস ব্যাগ নিয়া আসিয়াছিলাম। ইন্দুভূষণ বোমাটি নিক্ষেপ করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তারপরে আমরা গঙ্গাপার হইয়া শ্যামনগরে যাই এবং সেখান হইতে ট্রেনে শিয়ালদহ পৌঁছি। আমার হাতে যে রিভলভার ছিল তাহা

ফাঁসিমঞ্চে ক্ষুদিরাম

কানাইলাল

বন্দীবেশে সত্যেন ও কানাই
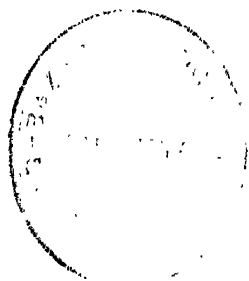
মেদিনীপুরের স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা সত্যেনের। চন্দননগর হইতে আসিয়া রিভলভারটি মাণিকতলায় জমা দিই।

পূর্ব্বে যে চারুবাবুর কথা বলিয়াছি, তাঁহার পূরা নাম, চারুচন্দ্র রায়, তিনি চন্দননগর ডুপ্লে কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক। কানাইলাল দত্ত তাঁহারই শিষ্য ও প্রিয়তম ছাত্র।

ইহার অল্পদিন পরে কুষ্টিয়ার একটি পাদরী সাহেব হিকেন বোথামকে গুলি করা হয়। কিন্তু তাহাতেও বেশ ফলোদয় হয় নাই।

আমি ক্ষুদিরামকে জানিতাম। তাহাকে যে মজঃফরপুরে পাঠানো হয় তাহা আমি জানি। আমি পূর্ণ সেনকে জানিতাম; শুনিয়াছি, ক্ষুদিরাম ও পূর্ণ তমলুকে একসঙ্গে পড়িত। ক্ষুদি-রামের একটী মোকদ্দমায়, পূর্ণ সেন ক্ষুদিরামের পক্ষে সাক্ষী দিয়াছিল কিনা আমি জানি না।

দেবব্রতবাবু একজন সন্ন্যাসী মানুষ। সত্যেন্দ্র বসু রাজ-নারায়ণবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। সত্যেন্দ্রই ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর মোকদ্দমার হাত হইতে বাঁচায়। বিপ্লব সমিতিতে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বড় কর্ত্তা এবং বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন ছোট কর্ত্তা।*

* ভারতের বিপ্লব কাহিনী—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

—পাঁচ—

কারাজীবন ও নরেন্দ্রকে হত্যা

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বিপ্লবী দলের ইতিকথা, সবিস্তারে বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, আলীপুর জেলের মধ্যে যে পঞ্চাশ জন বিপ্লবী ছিলেন, তাহারা কি উপায়ে বৃটিশের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। কারণ, এই গুরুতর বিষয়টির সত্বর মীমাংশা করিতে না পারিলে, কর্ত্তৃপক্ষ সহিংষ আন্দোলনকে যে অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া দিবেন তাহা সুনিশ্চিৎ।

অতঃপরে স্থির হয় যে, জেলের বাহিরে যে সমস্ত সভ্য আছেন তাহাদিগকে বোমা প্রস্তুতের প্রণালী এবং নূতন সভ্য সংগ্রহ করিবার নিয়মাবলী, গুপ্ত ভাবে প্রহরীগণকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া, প্রেরণ করা হউক এবং তাহারও বাহির হইতে যতদূর সম্ভব রিভলভার ইত্যাদি গোপনে পাঠাইবার চেষ্টা করুক। তাহা হইলেই একটী ব্যবস্থা নিশ্চই করিতে পারা যাইবে।

বারীন্দ্রবাবুর ইচ্ছা ছিল যে, জেলের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র কিছু সংগৃহীত হইলে, তাহারা সদলবলে জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইবেন, এবং বাঙ্গলা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন পর্ব্বতের গুহায় দুর্গ স্থাপন করিয়া, গরিলা যুদ্ধে সরকার বাহাদুরকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবেন। বারীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে পাঁচজন ব্যতীত সকলেই সম্মত হন এবং বাহির হইতে গোপনে প্রহরীদের দৃষ্টির অগোচরে, কখনও বা খাবারের চুবড়ির মধ্যে, কখনও বা পায়খানার মেথরের সহায়তায় একটি একটি করিয়া রিভলভার জেলের মধ্যে আসিতে আরম্ভ করে।

কানাইলাল নূতন সভ্য, তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু অভি-যোগও ছিল না, সেই জন্য তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ দত্ত তাহাকে জামিনে খালাস করিবার জন্য উকিল নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে রাজি হন নাই। উকিল তাহাকে বহুভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কানাইলাল বলেন যে, আমার সঙ্গীদের অদৃষ্টের সহিত যখন আমার অদৃষ্ট এক সঙ্গে জড়িত, তখন সকলের যাহা হইবে আমার তাহা হউক, ইহাই আমি চাই। উকিল বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

জেলের মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের সহিত কানাইলালের তিনবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় মতিবাবুর সহিত কানাইলালের যে কথোপকথন হইয়াছিল,তাহা উল্লিখিত হইল :

কানাইলাল—"......মনে করিও না জেলে পচিবার জন্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আন্দামানে অথবা ফাঁসি কাষ্ঠে নিরীহ মেষের মত প্রাণ দিতে জন্মিয়াছি।"

মতিবাবু—" তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো তেমন গুরুতর কিছু নাই, সুতরাং মুক্তির আশা একেবারেই যে নাই, এমন ধারনা করিতেছ কেন?"

কানাইলাল—"আমার বন্ধুদের সহিত সমান দশা ভোগ করিতে না পারিলে, আমি নিজেকে অত্যন্ত হতভাগ্য বলিয়া মনে করিব?"

জেলের মধ্যে মোকর্দ্দমার ফলাফল কিরূপ হইবে তাহা হইয়া প্রায়ই তর্ক বিতর্ক হইত। কানাইলালের সহিত শচীন্দ্র কুমার সেনের একদিন ভীষণ তর্কাতর্কি হয়। নিম্নে তাহাদের কথাগুলিও উদ্ধৃত হইল :

কানাইলাল—"খালাসের কথা ভুলে যাও, সব বিশ বৎসর করিয়া কালাপানি।"

শচীন—"কখনই নয়—বিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশ মুক্ত হইবেই হইবে।"

কানাইলাল—"দেশ মুক্ত হোক আর না হোক আমি হবো। বিশ বৎসর জেল খাটা আমার পোষাবে না।"

জেলের মধ্যে সকলেই বেশ আনন্দে ছিলেন; কানাইলালও জেলের মধ্যে যে কিরূপ ছিলেন, তাহা তাহার জেলের সঙ্গী

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

"স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহা ফুর্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, আমরাও সেইরূপ আদালত ভাঙ্গিবার পর গান গাহিতে গাহিতে চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতাম। তাহার পর সন্ধ্যার সময় যখন সভা বসিত তখন বার্লি সাহেব কি রকম ফিরিঙ্গি বাঙ্গলায় সাক্ষীদের জেরা করে, নর্টন সাহেবের পেণ্টুলোনটা কোথায় ছেঁড়া, আর কোথায় তালি লাগান, কোর্ট ইন্সপেক্টরের গোঁফের ডগা ইঁদুরে খাইয়াছে, কি আরশুলায় খাইয়াছে—এই সমস্ত বিষয়ে উল্লাস-কর গভীর গবেষণা করিত; আর আমরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতাম।

কানাইলাল প্রভৃতি চার পাঁচ জন নিদ্রার কাজটা সন্ধ্যার পরেই সারিয়া লইত। রাত ১০টা ১১টার সময় সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন তাহারা বিছানা ছাড়িয়া কাহার কোথায় সন্দেশ, আম, বিস্কুট লুকান আছে তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। যে দিন সে সব কিছু মিলিত না, সে দিন এক এক গাছা দড়ি দিয়া কাহারও হাতের সহিত অপরের কাছা বা কাহারও কাণের সহিত অপরের পা বাঁধিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে শুইয়া পড়িত। একদিন রাত্রে প্রায় একটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া

দেখি কানাই একজনের বিছানার চাদরের তলা হইতে একটা বিস্কুটের টিন চুরি করিয়া মহানন্দে বগল বাজাইতেছে। অরবিন্দবাবু পাশেই শুইয়াছিলেন। আনন্দের সশব্দ অভিব্যক্তিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কানাই অমনি খানকয়েক বিস্কুট লইয়া তাঁহার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বিস্কুট লইয়া অরবিন্দবাবু চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন; নিদ্রাভঙ্গের আর কোনও লক্ষণই দেখা গেল না! চুরিও ধরা পড়িল না।"

ইনস্পেক্টর সামসুল আলামকে দেখিতে পাইলেই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সকলে নিম্নলিখিত গানটি প্রায়ই করিতেন ঃ

"ওগো সরকারের শ্যাম, তুমি আমাদের শূল
তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু—
তুমি দেখবে চোখে সর্ষেফুল।"

জেলের মধ্যে যখন বিপ্লবীগণের জীবন যাত্রা নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কাটিতেছিল, সেই সময় জেল কর্তৃপক্ষের কথায় তাহারা বুঝিতে পারিলেন, যে, কোথাও যেন একটা গোলমাল হইয়াছে; নচেৎ নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে বৈপ্লবিক কেন্দ্র আছে কি না এবং থাকিলে সেই সকল কেন্দ্রের নেতাদের নাম কি, ইত্যাদি এত অনুসন্ধান করিতেছে কেন?

কানাইলাল এই সব বিষয়ে কিছুই মাথা ঘামাইতেন না,

তিনি তাহার নিজের আনন্দেই জেলে থাকিতেন। একদিন হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল উপেন্দ্রবাবুর নিকট আসিয়া নরেন্দ্রনাথের বিপ্লব বিষয়ে অহেতুক অনুসন্ধিৎসার কথা বলেন। এই বিষয়ে তাহাদের নিম্নোক্তরূপ কথা বার্ত্তা হইয়াছিল ঃ

হৃষিকেশ—"গোটা দুই তিন বেয়াড়া রকমের মান্দ্রাজী বা বর্গি টর্গির নাম বানিয়ে দিতে পারিস ?"

উপেন্দ্রনাথ—"কেন ?"

হৃষিকেশ—"নরেন বোধ হয় পুলিশকে খবর দিচ্ছে ; গোটা কতক উদ্ভট রকমের নাম বানিয়ে দিতে পারলে স্যাঙ্গাতরা দেশময় অশ্বডিম্ব খুঁজে খুঁজে বেড়াবে খ'ন।"

উপেন্দ্রনাথ—"মান্দ্রাজী নাম যে তৈয়ারী করা শক্ত।"

হৃষিকেশ—"যখন চিদম্বরম্ মান্দ্রাজী নাম হইতে পারে, তখন বিশ্বম্ভরম্ কি দোষ করিল ? আর পিলের বদলে যকৃৎ বা অমনি একটা কিছু পুরিয়া দিলেই চলিবে।"

বলা বাহুল্য যে, তাহাই হয় এবং পুলিশ ভারতের বহু স্থানে অনুসন্ধান করিয়া সেই সমস্ত নামে কোন লোকেরই সন্ধান পায় নাই। সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে মেদিনীপুর হইতে আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় ; তিনি নরেন্দ্রনাথের বিষয় এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। সেই সময় তিনি সর্দ্দি-কাশিতে ভুগিতেছিলেন বলিয়া,তাহাকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

অবশেষে, জেলের মধ্যে যে বিষয় লইয়া কানা-ঘুষা চলিতেছিল, তাহাই সত্যে পরিণত হইল। বিপ্লবীগণের বিচার আরম্ভ হইবার তিন চার দিন পরেই, নরেন্দ্রনাথ ২৫শে জুন তারিখে সরকারী সাক্ষী হইয়া কাঠগড়ায় গিয়া দাঁড়াইল।

নরেন্দ্রনাথ যখন রাজ-সাক্ষী হইয়াছে এই কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল, তখন কানাইলালের জননী ব্রজেশ্বরী দেবী, তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"এমন কি কেহ নাই যে, এই নরাধমকে ইহজগৎ হইতে সরাইয়া দেয়।"

তখন কে জানিত যে, তাঁহর কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তাঁহারই পুত্র কানাইলাল প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির পর শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ পাঁচ জন বিপ্লবী মিলিয়া বারীন্দ্রবাবুকে গোপন পূর্ব্বক একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন এবং তাঁহারা নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করাই স্থির করেন।

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় লিখিয়াছে যে "প্রথম হইতেই মতের পরিবর্ত্তন করায় বারীন্দ্রকুমারের অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল, এই ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে বাধা দিবেন, এ বিষয়ে ইহারা নিঃসন্দেহ হইয়া ছিলেন। প্রথম স্বীকারোক্তিতে বিপ্লব নিবারণ চেষ্টা, তারপর আবার বিপ্লব দল গঠনের যুক্তি, পরিশেষে নিজেরাই জেলের বাহিরে গিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠান সফল

করার সঙ্কল্প, ইহার কোনটাই ইহাদের মনঃপুত হইতেছিল না।'

জেল কর্ত্তৃপক্ষ নরেন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় ওয়ার্ডে, সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ আলী-পুরে আসিয়া অবধি অসুস্থ্যতার জন্য হাঁসপাতালে ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক সত্যেন্দ্রনাথও নরেন্দ্রের ন্যায় রাজ-সাক্ষী হইতে ইচ্ছুক, এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে খবর পাঠান এবং বলেন যে, উভয়ে একত্রে পরামর্শ করিয়া এজাহার দিলেই ভাল হয়। কারণ, তাহা হইলে নরেন্দ্রনাথ কেবল যে একজন সমর্থক পাইবে তাহাই নয়, অধিকন্তু অসংলগ্ন কিছু থাকিলে তাহাও শোধরাইয়া যাইবে এবং তাহাদের সাক্ষ্যও খুব জোর হইবে। সত্যেনের কথায় বিশ্বাস করিয়া নরেন্দ্র-নাথ পুলিশের অনুমতিক্রমে, তাহার সহিত হাঁসপাতালে সাক্ষাৎ করেন।

কানাইলাল সত্যেন্দ্রনাথের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া এই কাজে তিনিও সত্যেনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। নরেন ও সত্যেনের রাজসাক্ষীর উপযোগী এজাহারের রিহ্যার-সেল হাঁসপাতালের ডাক্তারখানায় চলিতে লাগিল। বারীন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক আনীত রিভলভার জেলের মধ্যে শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোর নিকট ছিল; রোগী ব্যতীত অন্যের যাওয়া হাঁসপাতালে নিষিদ্ধ থাকিলেও, তিনি কাপড়ে জড়াইয়া একটি রিভলভার

সত্যেনকে দিয়া আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত রিভলভারটি মরচে পড়া থাকায়, তিনি ইহার দ্বারা নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করিতে সাহসী হন নাই। তিনি অন্য আর একটি রিভলভারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নানা অছিলায়, এজাহারের কথাগুলি তাহার যেন মনে থাকিতেছে না, এই ভাবের ভান করিয়া কেবলই সময় লইতে লাগিলেন।

হেমবাবু প্রথম রিভলভারটি যখন লুকাইয়া হাঁসপাতালে সত্যেনকে দিতে চান, তখন হাঁসপাতালের ডাক্তার মিঃ চ্যাটার্জি তাহাকে বিনা অনুমতিতে হাঁসপাতালে সাক্ষাৎ করিতে আসার জন্য সতর্ক করিয়া দেন। সেইজন্য দ্বিতীয় রিভলভারটি তিনি স্বয়ং লইয়া যান নাই; কানাইলালকে দিয়া ইহা সত্যেনকে পাঠান হয়।

কানাইলাল কিন্তু উহা যে, কি বস্তু তাহা প্রথমে জানিতেন না, পরে জানিতে পারায়, তিনি তাহাকে সাহায্য করিবার অনুমতি চান। সত্যেন্দ্রও তাহাতে রাজী হন এবং স্থির হয় যে, আগামী কল্য ৩১শে আগষ্ট প্রাতঃকালে নরেন যখন এজাহার লিখিবার জন্য হাঁসপাতালে আসিবে, তখন এই কার্য্যটি সমাধা করা হইবে।

সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে কানাইলালের পেট কামড়াইতে লাগিল এবং তিনি একখানি চাদর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তিনি এইভাবে শুইয়া আছেন ; তদুত্তরে কানাইলাল বলিয়াছিলেন যে, "আমি 'শব-সাধনা' করিতেছি।"

পূর্ব্বদিনের অসমাপ্ত এজাহার লিখিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ সকাল সাতটার সময় সত্যেনের সহিত দেখা করিতে আসেন। হিগিনস্ নামক একজন ইউরোপীয় কয়েদী তাহার দেহরক্ষী রূপে আসিলেও, খোলাখুলি ভাবে কথাবার্ত্তার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে অন্যত্র সরিয়া যায়। কানাইলাল সেই সময় দাঁত মাজিবার ভান করিয়া একতলার বারান্দায় ঘাটি আলগাইয়া রাহলেন, যাহাতে নরেন্দ্রনাথ পলাইয়া যাইতে না পারেন।

দোতলায় হাঁসপাতালের ডিস্পেন্সারীতে উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল ; সত্যেন পূর্ব্ব হইতেই রিভলভারটিকে কোমরে দড়ি দিয়া, ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ তিনি রিভলভার বাহির করিয়া নরেনের দিকে ছুড়িলেন, গুলি নরেনের উরুতে বিদ্ধ হইল, তিনি 'খুন' 'খুন' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে প্রাণভয়ে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হিগিন্স পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল ; গুলির শব্দ শুনিয়া সে ডিস্পেন্সারী ঘরে আসিয়া ব্যাপারটি বুঝিল এবং সত্যেন্দ্রনাথের নিকট হইতে রিভলভারটি কাড়িতে গেল। উভয়ের ধস্তাধস্তিতে একটি গুলি হিগিন্সের হাতে লাগিল এবং সেও প্রাণভয়ে চিৎকার করিতে করিতে পলাইয়া গেল।

কানাইলাল কি করিয়া নরেন্দ্রনাথকে শমন-সদনে পাঠাই-লেন, তাহার প্রামাণিকবিবরণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কথা কহিতে কহিতে যখন সত্যেন পিস্তল বাহির করিয়া তাহার উরু লক্ষ্য করিয়া গুলি করে, তখন নরেন ঘর হইতে পলাইয়া যায়। পলাইবার সময় তাহার পায়ে একটি গুলি লাগিয়াছিল, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। গুলির শব্দ শুনিবামাত্র কানাইলাল হাসপাতালের নীচে হইতে উপরে ছুটিয়া আসে। ইউরোপীয় প্রহরী তাহাকে ধরিতে যায়, কিন্তু হাতে একটা গুলি খাইয়া সে সেইখানেই পড়িয়া চীৎকার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে নরেন নীচে আসিয়া হাসপাতালের বাহির হইয়া পড়ে।

ইউরোপীয় প্রহরীকে ধরাসায়ী করিয়া কানাই যখন নরেনকে খুজিতে থাকে তখন সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং হাসপাতালের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একজন প্রহরী সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

কানাই তাহার বুকের কাছে পিস্তল ধরিয়া ভয় দেখায় যে, নরেন কোথায় পলাইয়াছে, তাহা যদি সে বলিয়া না দেয় ত তাহাকে গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। বেচারা দরজা খুলিয়া দিয়া বলে যে, নরেন অফিসের দিকে গিয়াছে। কানাই ছুটিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে নরেনকে দেখিতে পায় ও গুলি

চালাইতে থাকে। গুলির শব্দ শুনিয়া জেলার, ডেপুটী জেলার, এ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার, বড় জমাদার, ছোট জামাদার সবাই সদলবলে হাসপাতালের দিকে আসিতেছিলেন। পথের মাঝে কানাইএর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয় বোধ করিলেন। কে যে কোথায় পালাইলেন, তাহার ঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না ; তবে জেলার বাবু যে তাঁহার বিপুল কলেবরের অর্দ্ধেকটা কারখানার একটা বেঞ্চের নীচে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন একথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

এদিকে কানাইয়ের হাত হইতে গুলি খাইতে খাইতে নরেন কারখানার দরজার কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। কানাইয়ের গুলি যখন ফুরাইয়া গেল তখন বন্দুক কীরিচ লাঠি-সোটা লইয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং কানাইকে ঘিরিয়া ফেলিল।”

নরেন্দ্রনাথের সংজ্ঞাহীন দেহ, হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেইখানে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“সত্যেনের গুলি ব্যর্থ হইল। কানাই প্রমাদ গুনিল, বালিশের তলা হইতে রিভলভার বাহির করিয়া ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত লম্ফ দিয়া শিকারের ঘাড়ে চাপিল—দুড়ুম দুড়ুম, দুড়ুম। রক্ত-

স্নাত হাস্যময় কানাইয়ের উন্নত ললাটে স্বদেশ জননী স্বহস্তে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন।

বিপ্লবযুগের এই দারুণ ব্যর্থতার মধ্যে, চূড়ান্ত সার্থকতার জয়ধ্বজা উড়িল, ভারতের ভাগ্য বিধাতা হাসিমুখে ভবিষ্য ভারতের ইতিহাস সেইদিন হইতে আবার নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বিধাতার অব্যর্থ নির্দ্দেশ পালন করিয়াই কানাইলাল অমর—জাতির সে মুকুটমণি, দেশ যাহা চাহিয়াছিল আপনাকে বলি দিয়া কানাই তাহা পূরণ করিয়াছে।"

সত্যেন ও কানাইলাল, নরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি গুলি করেন; তন্মধ্যে চারটি গুলি নরেন্দ্রের শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ হয়, একটি গুলি ডিস্পেন্সারীর ভিতরের দেওয়ালে, দুইটি গুলি বাহিরে এবং শেষ গুলি নরেন্দ্রনাথের বক্ষে বিদ্ধ হয়। কানাই সমস্ত গুলি শেষ করিয়া রিভলভারটি মাটীতে ফেলিয়া দিলে, তবে তাহাকে সাহস করিয়া ধরা হয়।

কানাইলাল সব গুলি কেন নরেন্দ্রনাথকে মারিয়াছিল তাহা তাহার বন্ধুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"আমরা যাহাই করি তাহাই narrow escape হইয়া (রগ ঘেসে) ব্যর্থ হয়, তাই যতগুলি গুলি পিস্তলে ছিল,

সব একে একে নরেনের শরীরে চালাইয়াছি—কি জানি দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি বাঁচিয়া উঠে।"*

কানাইলাল কর্ত্তৃক দেশদ্রোহী নরেনের হত্যার পর, জেলের মধ্যে কেহই ব্যাপারটা যে কি, ঘটিয়াছে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। একটি চোর আসিয়া উপেন্দ্র বাবুকে প্রথমে সংবাদ দেয় যে, নরেন্দ্রনাথ নিহত হইয়াছে। জেলের মধ্যে তাহাদের নিম্নোক্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

চোর—"বাবু নরেন গোঁসাই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!"

উপেন্দ্রবাবু—"ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি রে?"

চোর—"আজ্ঞে হাঁ বাবু; কানাই বাবু তাকে পিস্তল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।"

উপেন্দ্র বাবু—"সে কি রে?"

চোর—"ঐ দেখুন গে না—কারখানার সুমুখে সে একদম লম্বা হ'য়ে পড়েছে। আর জেলার বাবুও আর একটু হলে হয়ে যেত। তিনি কারখানায় ঢুকে পড়ে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে প্রাণটা খুব জোর বাঁচিয়েছেন।"

* বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী—শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

—ছয়—

প্রাথমিক অনুসন্ধান ও বিচার

মাণিকতলা বোমার মামলায় কানাইলাল ছিলেন একজন সামান্য কর্ম্মী, সুতরাং তিনি সেই সময় বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। তিনি ছিলেন শান্ত শিষ্ট, তাঁহার প্রকৃতি ছিল খুব ঠাণ্ডা, ভাল মানুষের ন্যায়। নরেন্দ্রকে হত্যার পর কানাইলালের খোঁজ পড়িল, দেশ দেশান্তরে তাঁর কীর্ত্তির কথা প্রচারিত হইল। ইংরাজ পরিচালিত ইংরাজী সংবাদ পত্র "ষ্টেট্সম্যান', 'ইংলিশম্যান', "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ" কানাইলালের কার্য্যকে কেবল তীব্র নিন্দা নয়, নানারূপ ক করিতে লাগিল এবং তাহাদের দেখাদেখি আমাদের দেশীয় পত্র "বেঙ্গলী" ও "অমৃতবাজার পত্রিকা"ও রাজদ্রোহের ভয়ে "মহাজন" দিগের পথানুসরণ করিল। বাঙ্গলা সংবাদ পত্র-গুলি ভয়ে ভয়ে সবদিক বাঁচাইয়া, কানাইলালের বীরত্বের কথা কিছু কিছু বিবৃত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলা যায়।

এলাহাবাদ হইলে ইংরাজ পরিচালিত ও সম্পাদিত একমাত্র "পাইওনিয়র" (The Pioneer) পত্রই সেই সময় সত্য কথা

বলিতে পরাম্মুখ হন নাই দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে, কানাইলালের সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :

"নরেন্দ্রনাথ নিজের আত্মরক্ষার্থে, তাহার সমস্ত সঙ্গীদের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সেসঙ্গে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে সে আরো ক্ষতি করিতে সমর্থ হইত, সেইজন্য কানাই-লাল ও সত্যেন্দ্রনাথ উহাকে পৃথিবী হইতে অপসারণ করে। এই স্থলে একজনের নিধনে, বহু লোকের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে।

"রাজসাক্ষীকে হত্যা 'খুন' বলিয়া পরিগণিত হইলেও, উহারা সহচরদিগের মঙ্গলের জন্যই অকুতোভয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে; ইহা কখনও হীন বা কাপুরুষোচিত কর্ম্ম নহে—ইহা আত্মত্যাগের গৌরবে সমুজ্জ্বল এবং ইহাতে 'আত্মাহুতি আছে।

"গ্রীক বীর 'হারমোডিয়াস' (Harmodius) এবং 'এ্যারিসটোজিটনের' (Aristogeitin) * ন্যায় যদি বঙ্গবাসী-গণ তাঁহাদের হৃদয় সিংহাসনে, এই দুই জন বীরকে বসাইয়া

---

* খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে হারমোডিয়াস ও এ্যারিস্টোজিটন জেলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দেশদ্রোহীকে নিহত করিয়া প্রাণ দেন এবং অদ্যাপি সেইজন্য তাঁহারা গ্রীস দেশে সর্ব্বত্র পূজিত। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বার এইরূপ কার্য্য করিয়া খ্যাত হন।

রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যে কি কেহ আপত্তি করিতে পারে ?"

"The shooting of the informer is indeed murder, but is self devotion. It is a case of his life against the lives of others and the two assasins resolved to sacrifice themselves for the sake of the rest.

"If the Bengalis like to enthrone those two young men (Kanailal and Satyendra Nath) in popular remembrance as another Harmodius, and Aristogeiton, it is not easy to see how any one could justly object to the action."

(Pioneer, 4th Sept., 1908).

সত্যনিষ্ঠ 'পাইওনিয়র' পত্রের ইংরাজ সম্পাদকের এই নির্ভিক উক্তিতে, কলিকাতার "ইংলিশম্যান", "ষ্টেটসম্যান" পত্রগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়। অধিকন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিকে, ঐরূপ লিখিলে "রাজদ্রোহ" হইত বলিয়া, দেশীয় কাগজগুলির সম্পাদকগণকে শাসাইয়া দেয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্টের পর, জাতীয় বন্ধনমুক্তি হওয়ায়, এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম কানাইলালের স্মৃতি পূজার

ব্যবস্থা করা হয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও "ষ্টেটসম্যান" ও "অমৃতবাজার পত্রিকার" 'জুজুর' ভয় দূর হয় নাই, ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। 'ষ্টেটসম্যান' না হয় ইংরাজ পরিচালিত সংবাদপত্র কিন্তু অমৃত বাজার পত্রিকা যাহারা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলিয়া সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই কার্য্য কখনও সমর্থন যোগ্য নহে। কানাইলালের 'স্মৃতি সভা'র বিশদ বিবরণ এক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ব্যতীত, বঙ্গের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিম্নে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' (Hindusthan Standard) পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :

"On this day thirty nine years ago, Kanailal paid the highest penalty for his fearless act in punishing a traitor to the cause of the motherland. In the roll of our revolutionary martyr the position of Kanai and his comrade Satyen is unique. The courage and resourcefulness of their action inside a British jail had had no precedent and their example was emulated some seventeen years later by another pair of heroes, Anantahari and Promoderanjan in Alipore Central Jail. On this memorable day, Bengal

should recall with pride that our patriotic tradition of self sacrifice has been built up by young idealists like Kanailal." (Hindusthan Standard, 10th November, 1947).

সংবাদপত্রের কথাগুলি আলোচনা করিতে করিতে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছি; এইবার নরেন্দ্রনাথকে হত্যার পর আলিপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যার (Mr. Marr) তৎপরদিবস হইতে, প্রাথমিক তদন্ত করিবার সময়, কয়েকজন সাক্ষী তাহাকে যাহা বলেন, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

লিণ্টন তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সে একজন কয়েদি; হিগিন্স গুলিতে আহত হইয়াছে শুনিয়া সে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের অফিস হইতে দৌড়াইয়া বাহির হয় এবং দেখিতে পায় যে, জেলার সাহেব ও হিগিন্স দৌড়াইয়া আসিতেছেন। পরে তাঁত কলের পাশের রাস্তাটি দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পায় যে, ডাক্তার চাটার্জ্জি একজন লোকের সহায়তায় নরেন্দ্র গোস্বামীকে ধরিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছেন। হঠাৎ ডাক্তার বাবুর, পিছনে কানাইলাল দত্ত দৌড়াইয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া বলে—"সকলে সরে যাও, নচেৎ গুলি কোরবো।" ডাক্তার বাবু নরেনকে লইয়া ছুটিতে লাগিলেন এবং তাহার পিছনে পিছনে কানাই ও সত্যেন দৌড়াইতে লাগিল।

অতঃপর লিণ্টন বলে যে, সে সত্যেনকে ধরিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাকে ধরিবার সময় সে গুলি ছোড়ে এবং গুলি নরেনের শরীরে বিদ্ধ হয় এবং নরেন ড্রেনের মধ্যে পড়িয়া যায়। অতঃপর সে সত্যেনের হাত হইতে রিভলভারটি কাড়িয়া উত্তর দিকে ফেলিয়া দেয় এবং একজন ওয়ার্ডার তাহা কুড়াইয়া লয়।

ইতিমধ্যে কানাই দৌড়াইয়া, আসিয়া জেলারের দিকে রিভলভার লক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে তাহার বাম হস্তখানি ধরিয়া ফেলে। কিন্তু কানাই রিভলভারের বাঁট দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করায়, তাহার কপাল কাটিয়া যায়। লিণ্টন পিছন দিক দিয়া কানাইলালের তুইখানি হাত ধরিবার পূর্ব্বেই, সে নরেন্দ্রকে গুলি করে। অতঃপর আর একজন ওয়ার্ডার আসিয়া পড়ে এবং তাহারা তুই জনে কানাইকে ধরিয়া ফেলে।

হিগিন্স তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সত্যেন বার বার নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠায়। শনিবার বেলা একটার সময় নরেন সত্যেনের নিকট হাঁসপাতালে গিয়া কথাবার্ত্তা বলে, সে তখন তাহাদের নিকটেই ছিল। পরে নরেন আমাদের ঘরে চলিয়া যায় এবং তখন সে জানিতে পারে যে, সত্যেনও রাজসাক্ষী হইবে।

সোমবার দিন পুনরায় সত্যেন্দ্রনাথ যখন নরেন্দ্র গোস্বামীকে ডাকিয়া পাঠায় ; তখন সে নরেনকে বলে যে "সত্যেনের মতলব

ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না।" তদুত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলে যে "সত্যেন অনেক কথা তাহাকে লিখিয়া দিবে বলিয়া অঙ্গিকার করিয়াছে" এবং সে নরেনের সহিত যাইলে সুখী হইবে। নরেন্দ্র ও সে হাসপাতালে প্রবেশ করিতেই, তাহারা সেই স্থানে সত্যেন্দ্র ও কানাইকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে।

নরেন ও সত্যেন ডিস্পেনসারীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুব আস্তে আস্তে কথা বলিতে থাকে এবং সে বারান্দায় অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর নরেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বলে "ঈশ্বরের দোহাই—আমাকে বাঁচাও, মিঃ হিগিন্স।"

নরেনের কথায় হিগিন্স পিছনে চাহিয়া দেখে যে, কানাই দুইটি পিস্তল নরেনের দিকে এবং সত্যেন একটি পিস্তল হিগিন্সের দিকে লক্ষ করিয়া দৌড়াইয়া আসিতেছে।

কানাই চিৎকার করিয়া তাহাকে বলিতে থাকে "সরে যাও নচেৎ তোমাকেও গুলি করব।" হিগিন্স কানাইকে কাবু করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার হাত গুলিতে বিদ্ধ হওয়ায়, সে তাহাদের ধরিতে পারে নাই। আসামীরা তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং সে পড়িয়া যায়।

তাহারা চলিয়া গেলে, সে পুনরায় উঠে এবং নরেনের পশ্চাতে পশ্চাতে পাটের কল পর্য্যন্ত যায়। ইতিমধ্যে কানাই দুইবার নরেনকে গুলি করে এবং নরেন নর্দ্দামার মধ্যে পড়িয়া যায়। এই সময় লিণ্টন আসিয়া পড়ে ও কানাইয়ের নিকট হইতে

রিভলভার কাড়িয়া নেয়। সেই সময় নরেন মাথা তুলিয়া "বিদায়—বিদায়…শেষ…" প্রভৃতি দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করে।

হাসপাতালের ডাক্তার বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি সোমবার প্রাতে নরেন্দ্র ও কানাইকে চুপি চুপি কথা বলিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যান। তিনি নরেন্দ্রকে একটু আড়ালে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"এ আপনার কেমন সাহস, একাকী হাসপাতালে আসিলেন—কেউ দেখে ফেল্লে আমাকে যে বিপদে পড়তে হবে?" তদুত্তরে নরেন্দ্র তাহাকে বলে "একটু দরকারী কাজ আছে, তাই এসেছি—মিঃ হিগিন্স আমার সঙ্গে আছেন।"

অতঃপর ডাঃ চ্যাটার্জ্জি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই শুনিতে পান যে, কে যেন টোটা ছুড়িয়াছে। তিনি এই কথা শুনিয়া ডিস্পেন্সারীর বাহিরে আসিয়া কানাই ও নরেন দুই জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে দেখিতে পান। তিনি তাহাদের ছাড়াইবার চেষ্টা করিবেন, এমন সময় কানাই একটা গুলি করে, তাহা ডাক্তারের কানের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। তাহার পর কানাই ডাক্তারকে গুলি করিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে, তিনি দৌড়াইয়া জেলারকে খবর দিতে চলিয়া যান।

জেলারকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তার চাটার্জ্জি ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্র নর্দ্দামায় পড়িয়া আছে তিনি দেখিতে পান এবং তাহারা

সেইস্থান হইতে তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যান ; সেই সময় নরেন্দ্রের প্রাণ বাহির হইতেছিল। হাসপাতালে নরেনকে বহু প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু দু-তিন মিনিটের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়।

জেলের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, রিভলভার দুইটি কি করিয়া হাসপাতালের মধ্যে আসিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। গত কল্য সত্যেন্দ্রের সহিত যখন সরোজিনী ঘোষ, মনীন্দ্র নাথ বসু ও মহেশচন্দ্র বসু জেলে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন তখন তিনিও তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সত্যেন্দ্র, অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকে তাহার অফিসের ভিতর আনান হয়, সেই স্থানে সরোজিনী ঘোষ প্রভৃতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় আধঘণ্টা তাহাদের কথাবার্ত্তা হয় এবং তিনি সেই সময় তাহাদের প্রতি লক্ষ রাখেন এবং মধ্যে মধ্যে কয়েকখানি চিঠিও সহি করেন। তিনি তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরীক্ষা করেন নাই—কারণ 'মেট'ই সাধারণতঃ পোষাকাদি পরীক্ষা ও তল্লাসী করে।

আলিপুর জেলের মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন ডেয়লি নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মৃত্যুর পর তাহার দেহ পরীক্ষা করেন ; তিনিও সাক্ষ্য দান করেন।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ, এ, ম্যর, যে সমস্ত সাক্ষ্য

গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধে কানাইলালের কিছু বলিবার আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, কানাইলাল বলেন যে, ইন্দ্রনাথ নন্দীর কথা সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্জ্জলা মিথ্যা এবং তিনটি রিভলভার ছিল বলিয়া, যাহারা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও সত্য নয়। ইন্দ্রনাথকে জড়াইবার জন্যই তিনটি রিভলভারের অবতারণা করা হইয়াছে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ইন্দ্রনাথ এই ঘটনার বিষয় কিছুই জানিতেন না—তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ম্যাজিষ্ট্রেট—"তাহ'লে তুমি স্বীকার করছো যে, তোমরাই নরেনকে মেরেছ।"

কানাই—"হাঁ—আমি ও সত্যেন আমরা উভয়ই নরেনকে মেরেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট—"কেন মেরেছ ?"

কানাই—"কেন মেরেছি তার কোন কারণ বলতে পারবো না—(একটু চিন্তা করিয়া) না—কারণটাও বলা দরকার, নরেন দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক তাই তাহাকে খুন করেছি। (Because he proved a traitor to the country)

দুই দিনের মধ্যেই প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্ব্ব শেষ হয় এবং মিঃ ম্যার মোকদ্দমাটি দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়া দেন। আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ এফ, আর, রো (Mr. F. Roe. I. C. S) সাহেবের আদালতে, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিচার

আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষে উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস এবং সত্যেনের পক্ষে উকিল ছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি এবং উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু। কানাইলাল আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিযুক্ত করেন নাই এবং মামলা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর আলিপুর সেসন্সে এই মোকদ্দমাটি হইবার কথা ছিল, কিন্তু জেলের মধ্যে কানাইলালের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া একটি ভূয়া সংবাদ কলিকাতায় রাষ্ট্র হইয়া যায়। এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার পর সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস, মিঃ রো সাহেবের নিকট ৬ই সেপ্টেম্বর এই বলিয়া আবেদন করেন যে, আলিপুরের অতিরিক্ত জজ মিঃ বিচক্রফটের নিকট এই মামলার বিচার হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও তিনি সত্বর ইহা বিচার করিতে পারিবেন না; অথচ নানা-কারণে এই মামলা সত্বর নিষ্পত্তি করা বিশেষ প্রয়োজন।

আশুবাবুর আবেদনে মিঃ রো সাহেব স্বয়ং ইহা বিচার করিতে আরম্ভ করেন। এই মামলায় মিঃ জে, এন, স্লি ও এইচ, নিকলস্ নামক দুই জন ইউরোপিয়ান এবং বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, আশুতোষ দত্ত, ও বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য নামক তিন জন বাঙ্গালী জুরী নির্ব্বাচিত হন। বিপিনবাবু অসুস্থ্য হইয়া পড়ায়, তাহার স্থলে শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় জুরী হন।

সোমবার ৭ই তারিখে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে ইচ্ছাপূর্ব্বক

জেলের মধ্যে হত্যা এবং লিণ্টন ও হিগিন্সকে হত্যার চেষ্টা করিবার জন্য কানাইলাল দত্তের, জুরীদের সমক্ষে বিচার আরম্ভ হয়। বিচারের সময় আদালত গৃহে খুব কড়া পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়; একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া কানাই ও সত্যেনকে এবং কয়েদিদের গাড়ি করিয়া সাক্ষীদের আদালতে লইয়া আসা হয়।

জজ সাহেব আসন গ্রহণ করিলে, সত্যেন্দ্রনাথের উকিল নরেন্দ্রনাথ বসু একখানি দরখাস্ত করিয়া বলেন যে, আইন অনুযায়ী বিচার করিবার এই আদালতের কোন ক্ষমতা নাই। সরকারী উকিল আশুবাবু তাহার প্রতিবাদ করিলে, জজ উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন এবং যথারীতি বিচার আরম্ভ হয়।

প্রথমে কানাই ও সত্যেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়িয়া শুনান হইলে, জজ সাহেব তাহাদিগকে দোষী কি নির্দ্দোষী এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে কানাই নির্ভিক ভাবে বলেন যে "আমি নির্দ্দোষ বলিতে অস্বীকার করি" (I decline to plead not guilty.)

জজ—"তুমি কি কোন উকিল দিবে ?"

কানাই—"আজ্ঞে না—ধন্যবাদ।"

জজ—"তুমি কি ইচ্ছা কর না যে,আদালত তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিযুক্ত করে ?"

কানাই—"না"

জজ—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা কি ঠিক?"

কানাই—"আজ্ঞে হাঁ, সবই ঠিক—কেবল সত্যেনের সম্বন্ধে আমি তাড়াতাড়িতে একটা ভুল বলিয়া ফেলিয়াছি। সত্যেন সেখানে ছিল বটে, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে লিপ্ত ছিল না; আমি একাই নরেন্দ্র গোস্বামীকে খুন করিয়াছি।"

জজ—"এই রিভলভার তুমি কোথায় পাইয়াছিলে?"

কানাই—"ক্ষুদিরামের প্রেতাত্মা ইহা আমাকে দিয়া গিয়াছে" (The Spirit of Khudiram supplied me with the revolver.)

জজ—"জুরী নির্ব্বাচনে তোমার আপত্তি আছে?"

কানাই— (নিরুত্তর থাকেন)

জজ—"তুমি আর কিছু কি বলিবে?"

কানাই—"আজ্ঞে না—আমার যা বলবার তা আগেই আমি বলেছি।"

অতঃপর সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস মামলার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, কানাই ও সত্যেন্দ্র ইহাদের মধ্যে যে কেহ একজন যে, গুলি করিয়া নরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। এক্ষণে উহারা উভয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে দুইজনেই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে; অধিকন্তু রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যত্র আর একটি মামলার বিচারও চলিতেছে।

নরেন্দ্র বসু আশুবাবুর * কথায় আপত্তি করিয়া বলেন—সত্যেন্দ্র যে নরেন্দ্র গোস্বামীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; সুতরাং উভয়ে একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এই কথা বলা ঠিক নয়। সরকারী উকিল এই বিষয়ে আরো প্রমাণ উপস্থাপিত করিবেন বলায়, জজ সাহেব নরেন বাবুর আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

সোমবার ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে বুধবার ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কানাই ও সত্যেনের মামলায় সাক্ষিদের জেরা করিয়া, রায় দেওয়া হয়। এই তিন দিনের মধ্যে শ্যামাচরণ খান্না, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লি, ইন্সপেক্টর বিনোদবিহারী গুপ্ত, গোপাল মাইতি, প্রসিদ্ধ বন্দুকওয়ালা ম্যাণ্টন কোম্পানীর (Messrs Manton & Co.) ব্রাউন সাহেব প্রভৃতির সাক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের সহিত ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জির বহু বাদানুবাদ হয় এবং আশুবাবুকে এই মামলা না করিবার জন্য, কয়েকখানি পত্রও বিপ্লবীগণ বাহির হইতে প্রেরণ করেন। দেশদ্রোহীকে শাস্তি দিয়া কানাই ও সত্যেন ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছে ; সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, তিনি যেন তাহার মৃত্যু ডাকিয়া না আনেন, এই ভাবের লাল

* ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী, তিনি খুলনা জেলার চারুচন্দ্র বসু নামক জনৈক যুবকের রিভলভারের গুলিতে, আদালত প্রাঙ্গনে নিহত হন।

কালিতে লিখিত বহু প্রকারের ভীতি-প্রদর্শক পত্র, তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আশুবাবু এই সমস্ত গ্রাহ্য করেন নাই।

শ্যামাচরণ খান্না ঘটনাস্থলের একটি নক্সা (drawing) আঁকিয়া আদালতে দাখিল করেন এবং বার্লি সাহেব কানাই ও সত্যেনের বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। সরকারী উকিল আশুবাবু, ইহাদের বিরুদ্ধে, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, তাহাও দাখিল করিতে চাহিলে, ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জির প্রতিবাদে, জজ সাহেব তাহা দাখিল করিতে দেন নাই।

ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি, ইন্সপেক্টর বিনোদবিহারী গুপ্তকে জেরা করায় তিনি বলেন যে, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তিনি পূর্ব্ব কথিত তৃতীয় রিভলভারটীর কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই।

জজ সাহেব কানাইলালকে বলেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সাক্ষীকে তিনি যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; কিন্তু কানাই বলেন যে, তাহার আর প্রশ্ন করিবার কিছুই নাই।

অতঃপর গোপাল মাইতি নামক জেলের একজন কয়েদি তাহার সাক্ষ্যে বলে যে "৩১শে আগষ্ট ঘটনার দিন বোমার মত একটি উচ্চ শব্দ শুনিয়া আমি বাহির হইবামাত্র দুই জনকে (কানাই ও সত্যেন) ধস্তাধস্তি করিতে দেখি।" গোপালের এই কথায় সরকারী উকিল আশুবাবু জজকে বলেন যে, এই

সাক্ষী আমাদের বিরুদ্ধে চলিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি তাহার এই উক্তিতে আপত্তি জানাইয়া, গোপালকে জেরা করিতে আরম্ভ করেন।

জেরার উত্তরে গোপাল মাইতি বলে যে, ডাকাতি ও খুনের মামলায় তাহার দশ বৎসর জেল হয়, কিন্তু জেলের মধ্যে সদভাবে থাকিবার জন্য, তাহাকে 'মেটের' অর্থাৎ অন্য কায়েদীদের কাজ-কর্ম্ম দেখিবার কার্য্য দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার দিন গোপাল, কানাই বা সত্যেনের হাতে সে কোন রিভলভার দেখে নাই। সে সত্যেনবাবুকে বারান্দায় বেড়াইতে দেখিয়াছিল; কানাইবাবু যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে নরেন কোথায়, তখন নরেন্দ্র গোস্বামী তাহার কাছে ছিল না নরেন্দ্রনাথকেও সে যখন দেখে, তখন তাহার মুখে কোন রূপ দাগ সে দেখিতে পায় নাই; বরং হিগিন্স কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়াছিল ইহা সে দেখিতে পায়।

অনুরূপ দাস নামক আর একজন কায়েদীও, তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, ঘটনার দিন সে সত্যেন্দ্রনাথকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তিনি, অনুরূপকে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে তাহার কাছে পাঠাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন। জেরার উত্তরে সে আরো বলে যে, কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথকে কখনও খোলাখুলিভাবে ঘনিষ্ঠতার সহিত মিশিতে সে দেখে নাই।

ম্যাণ্টন কোম্পানীর মিঃ ব্রাউন রিভলভারের গুলির সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন; তিনি বলেন সম্ভবতঃ তিনটি মাত্র গুলি করা হইয়াছিল।

বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একজন কয়েদীও তাহার সাক্ষে বলে যে, সত্যেন্দ্রনাথের হাতে রিভলভার সে দেখে নাই।

জেলের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন যে, তিনি কানাই লালকে নরেন্দ্রের উপর গুলি চালাইতে সচক্ষে দেখিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের হাতে একটি রিভলভার ছিল বলিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত রিভলভারটি তিনি নিজে সত্যেনের হাতে দেখেন নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল ডুপ্লে কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি: উক্ত কলেজের ফরাসী অধ্যক্ষ কানাইলালের কলেজের স্বভাবচরিত্র খুব ভাল ছিল বলিয়া সাক্ষ্য দেন এবং বলেন যে, কানাই পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল এবং কলেজের পরীক্ষার প্রতি বিষয়ে খুব ভাল নম্বর পাইত।

ইউরোপীয় কয়েদী হিগিন্স মামলার অনুসন্ধানের সময় যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহারই পুনরুক্তি করে। ডাক্তার বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অমূল্য নামক জনৈক কয়েদীও সাক্ষ্য দেয়।

জজ সাহেব পুনরায় কানাইলালকে তাহার কিছু বলিবার

কানাইলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর ডাঃ আশু।

'দেশদ্রোহী'—নরেন গোঁসাই
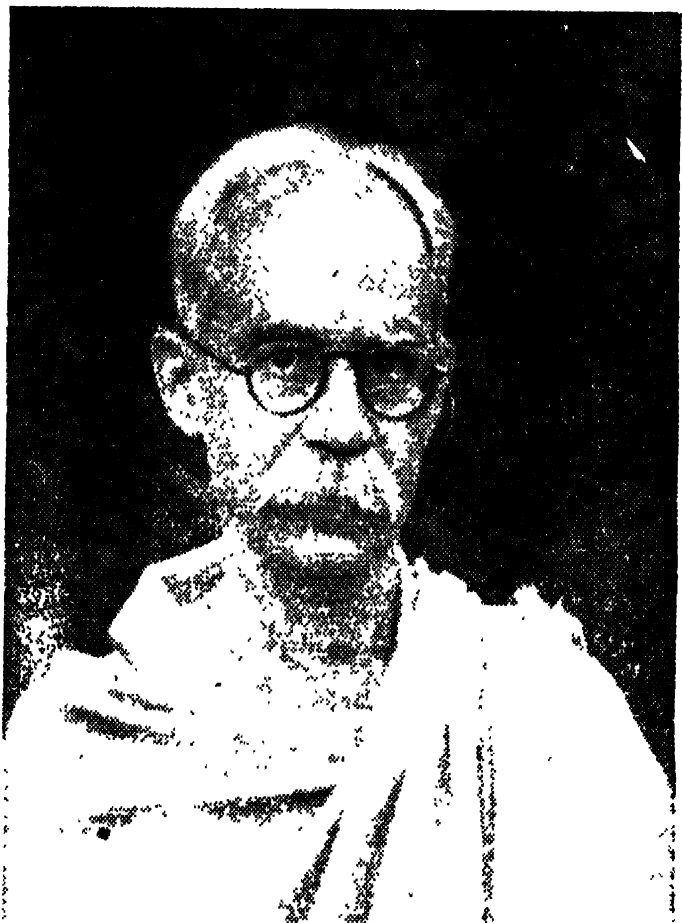
আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু কানাইলাল পূর্ব্বের ন্যায় সহাস্য মুখে "আজ্ঞে না" বলিয়া তাহার প্রশ্নের জবাব দেন।

উকিল নরেন্দ্রনাথ বসু এবং ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি বিচক্ষণতার সহিত সাক্ষীদিগকে জেরা করিবার পর, তৃতীয় দিবসে জুরীদের নিকট এই মোকদ্দমার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণ খুব সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কানাইলাল হুগলী কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্স লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষা দেন, এবং ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার জন্য তাহাকে ডিক্রি দেওয়া হয় নাই। ইহাতে দেশের লোকে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেও তৎকালে সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে কেহ কোন কথা বলেন নাই। *

* প্রায় চল্লিশ বৎসর পর, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর কানাই-লালের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী, এই নগণ্য লেখকের চেষ্টায় কলিকাতা ইউ-নির্ভাসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী এবং কানাইলালের বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কানাইলালের স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করেন ; এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী উক্ত সভার উদ্বোধন করেন।

এই সভায় পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত গণপতি সরকারের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। "কানাইলাল দত্তের এই স্মৃতি-সভা দাবী

যাহা হউক, জজ সাহেব জুরীগণকে 'চার্জ্জ' বুঝাইয়া দিবার সময় কানাইলালের শাস্তির জন্য বিশেষ জোর দেন এবং সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে, সপক্ষে ও বিপক্ষে যাবতীয় বিষয় বুঝাইয়া দেন। ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জি এবং দায়রা-জজ রো সাহেব খুব দক্ষতার সহিত ঘটনার প্রত্যেক বিবরণ জুরীদের সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং কানাইলালকে পুনরায় তাহার কিছু বলিবার আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করেন।

কানাইলাল মৃদুস্বরে জজ সাহেবকে বলেন—"হুজুর—আমি ও সত্যেন এই খুনের জন্য দায়ী, পূর্ব্বে আমি এই কথাটি বলিয়াছিলাম ; কিন্তু এখন আমি এই কথাটি প্রত্যাহার করিয়া বলিতে চাই যে, **আমি একাই এই খুনের জন্য দায়ী**—কেহ আমাকে কোন সাহায্য করে নাই।"

কানাইলালের এই উক্তিতে আদালত গৃহ যেন নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল, বহু লোক এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, ইংরাজ জজ মিঃ রো কানাইলালের উক্তি শুনিয়া

জানাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদিন সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে পড়িয়া তথাকথিত দুর্নীতির জন্য কানাইলাল দত্তের বি-এ. ডিক্রি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খারিজ করিয়া যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছেন, বর্ত্তমান ভারতে, সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য, তাহা পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকে (Calender) নথিভুক্ত করা হউক, কারণ জাতি কানাইলালের কার্য্যকে ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে করেন।"

বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও হতবাক্ হইয়া গেলেন—ক্ষণেকের জন্য তাঁহার লেখনীও স্তব্ধ হইয়া গেল।

জুরীরা সজল নয়নে অন্য ঘরে আলোচনা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। কানাইলাল মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে, কেবল তাহার স্বীকারোক্তি ব্যতীত, সত্যেনের বিরুদ্ধে আর কিছুই নাই, তখন তিনি সহকর্ম্মীকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধেই তুলিয়া লন।

একঘণ্টা পর আলোচনান্তে জুরীগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং কানাইলালকে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন।

জজ সাহেব কানাইলালকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। সত্যেন্দ্রনাথকে দুই জন শ্বেতাঙ্গ জুরী দোষী এবং তিন জন বাঙ্গালী জুরী নির্দ্দোষী বলায়, জজ সাহেব সত্যেনের মোকর্দ্দমা পুনরায় বিচারের জন্য হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর তারিখে, হাই-কোর্টে বিচারপতি মিঃ কক্স ও বিচারপতি মিঃ সফিরুদ্দিনের এজলাসে, সত্যেন্দ্রনাথের মোকদ্দমার শুনানী হয়; কানাইলালের ফাঁসির হুকুমও হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া, ইহাও সত্যেনের মোকর্দ্দমার সহিত উত্থাপিত হয়।

কানাইলাল হাইকোর্টেও কোন উকিল নিযুক্ত করেন

নাই ; সত্যেনের পক্ষে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, রায় তাহার নির্দ্দোষীতা প্রমাণের জন্য বহু সুযুক্তির অবতারনা করেন, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই নিস্ফল হয়। ২১শে অক্টোবর তাঁহার সত্যেন্দ্রনাথকেও প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং এই সঙ্গে কানাইলালের দণ্ডও অনুমোদন করেন।

—সাত—

ফাঁসির প্রতীক্ষায়

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর কানাইলালকে একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। তিনি সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ ও গীতা পাঠ করিয়া সময় কাটাইতেন। তখন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার আশুতোষ দত্তের সহিত দুইবার মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং অন্যান্য বিপ্লবীগণ প্রতিদিন কোর্টে মামলার জন্য যাইবার ও আসিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইতেন। তিনি সহাস্যমুখে প্রতিদিনই তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেন।

কানাইলালের চেহারা বা মুখ দেখিয়া তাহার যে কোন দণ্ড হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। তাহার প্রফুল্লতা এরূপ বাড়িয়া যায়, যে ফাঁসীর পূর্ব্বে তাহার ওজন প্রায় আটসের বাড়িয়া গিয়াছিল। মৃত্যুদণ্ড শুনিয়া দেহের ওজন বাড়িয়া যাওয়ার নিদর্শন পৃথিবীতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কানাইলালের শান্ত ও নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যাইতেন।

প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে কানাইলাল একটি ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার দাদা ব্যতীত কানাই-লালের সহিত আর কেহই সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পান নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীমতিলাল রায় ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য বোমার আসামীগণ তাহাকে প্রায় প্রত্যহই দর্শন করিতেন বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত কোন কথাবার্ত্তা কানাইলালের হয় নাই। তথাপি তাঁহাদের লিখিত বিবরণ প্রামাণিক বলিয়া এই অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত করিলাম।

"নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর, কানাইলালের অগ্রজ মাত্র দুইবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর আশু বাবু কানাইলালের সহিত যখন প্রথম সাক্ষাৎ করেন তখন কানাইলাল প্রফুল্লবদনে অগ্রজকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—ফাঁসীর দিন কি স্থির হইয়াছে? যেন সে জীবনের কাজ শেষ করিয়া পরপারের প্রতীক্ষা করিতেছে, মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই। এমন মুক্ত সচ্ছন্দ অবস্থা দেখিয়া আশুবাবুর মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। দুইজন ইউরোপীয় ওয়ার্ডার আশুবাবুকে বলিল "He is a wonderful chap, he is always bright," একথা সকলেই শুনিয়াছেন, যে চিররুগ্ন কানাইলাল মৃত্যুদণ্ডাদেশ শ্রবণের পর নূতন স্বাস্থ্যে, নূতন সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল,

তাহার দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বর্গীয় লাবণ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আশুবাবু কানাইলালের হাতখানি একবার স্পর্শ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আদেশ না থাকায় ওয়ার্ডার যুগল প্রথমে ইহাতে আপত্তি করে ; পরে তাহারা বলে 'বাবু আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেছি এই অবসরে আপনি কর মর্দ্দন করুন।' সে স্পর্শ ভুলিবার নয়, সে অনুভূতির আস্বাদ অব্যক্ত, ভাষায় তাহা কলঙ্কিত হয় মাত্র। কানাইলালের তখন উচ্চ অবস্থা ও পরম ভাব ; সে তখন মৃত্যুঞ্জয়ী শিব—প্রতি মুহূর্ত্তে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার আহ্বান প্রতীক্ষায় কোন রক্ত মাংসের মানুষ এমন আনন্দ ও শান্তিতে দিনের পর দিন রুদ্ধ কারায় নবীন স্বাস্থ্যে জীবন ভরাইয়া তুলিতে পারে ? সে সময় কানাইলালের সঙ্গে ছিল একখানি গীতা, আর একখানি বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ।" *

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—"আমরা যখন বাহিরে ঘুরিতাম তখন কানাই ও সত্যেনের কুঠরীর দরজা বন্ধ থাকিত। একদিন দেখিলাম কানাইলালের ফাঁসির দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রহরীরা দয়া করিয়া কানাইকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

* কানাইলাল—শ্রীমতিলাল রায়

যাহা দেখিলাম তাহা দেখিবার মত জিনিষই বটে! আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে, জীবনের বাকি কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখিয়াছি; কিন্তু কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে।

চিত্রকুটে ঘুরিবার সময় এক সাধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জীবন ও মৃত্যু যাহার কাছে তুল্যমূল্য হইয়া গিয়াছে সেই পরমহংস; কানাইকে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িয়া গেল। জগতে যাহা সনাতন, যাহা সত্য, তাহাই কোন শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহার কাছে ধরা দিয়াছে—আর এই জেল, প্রহরী, ফাঁসিকাঠ, সবটাই মিথ্যা, সবটাই স্বপ্ন! প্রহরীর নিকট শুনিলাম ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে! ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তিনিরোধের এমন পথও আছে যাহা পাতঞ্জলিও বাহির করিয়া যান নাই। ভগবানও অনন্ত, আর মানুষের মধ্যে তাঁহার লীলাও অনন্ত।" †

কানাইলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার আশুতোষ দত্ত বলিয়াছিলেন—"কানাইয়ের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমি তাহার

† নির্ব্বাসিতের আত্মকথা—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জেলে কর্তৃপক্ষীয়দের নিকট আবেদন করাতে তাঁহারা আমাকে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। সুপারিনটেনডেণ্ট আমাকে যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমি আমার মাতার পক্ষ হইয়া নিরালায় কানাইয়ের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করাতে তিনি বলিলেন যে তিনি দেখা করাইয়া দিতে পারেন না, সেজন্য অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি আমাকে জেলের দরজার নিকট অপেক্ষা করিতে বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর, জেলরক্ষক আমার নাম লিখিয়া লইল, এবং খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল।

আমার সহিত দুইজন প্রহরী ছিল, সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গনের একধারে প্রহরীবেষ্টিত গারদ। আমাদের জন্য তাহার দরজা খোলা হইল এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, আমাদের দক্ষিণের প্রথম কক্ষেই কানাই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পদচারণ করিতেছে। তাহার চশমা না থাকার দরুণ, সে আমাদের চিনিতে পারে নাই, তথাপি নির্ভীক দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখিল। সে আমার সহিত বেশ হাসিয়া কথা কহিল। আমি তাহার এইরূপ আচরণে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সমস্ত কথা আমি ভুলিয়া গেলাম। সে এরূপ উৎসাহের সহিত তাহার ফাঁসির কথা আমায়

জিজ্ঞাসা করিল, যেন তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, সে চলিয়া যাইতে ব্যগ্র।

কানাইলাল মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, আমাকে অনুরোধ করিল, এবং বলিল যেরূপ ভাবে জেলে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে এখানে মাকে আনিবার আবশ্যকতা নাই। কর্তৃপক্ষীয়েরা অনুমতি দিলে সে তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর দেখিলাম না। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও মার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।"

—আট—

ফাঁসির মঞ্চে

১০ই নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে কানাইলালের ফাঁসির দিন স্থির হয়। ৯ই নভেম্বর রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দের "কর্ম্মযোগ" ও "গীতা" পাঠ করিয়া শয়ন করিতে তাঁহার একটু দেরী হইয়া যায়। সচ্ছন্দভাবে পড়া শেষ করিয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

ভোর পাঁচ ঘটিকার সময় তিনশত সশস্ত্র সিপাহী জেলের মধ্যে সমবেত হইল; তাহার একটু পরেই কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার মিঃ হ্যালিডে, আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোমপাস, আলিপুর জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ ইমারসন ও কয়েকজন সংবাদ পত্রের রিপোর্টার জেলখানায় উপস্থিত হইলেন। তখনও কানাইলাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে তাঁহার গৃহের দরজায় মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগিলেন—কানাইলাল জাগিয়া উঠিল। গৃহের সম্মুখে সাহেবকে দেখিয়া সহাস্য বদনে কানাই তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন এবং রাত্রে একটু বেশী বই পড়িবার জন্য, উঠিতে বিলম্ব হওয়ায়, তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

পূর্ব্বদিক অরুণরাগে তখনও রঞ্জিত হয় নাই—ক্ষীণ চন্দ্রালোক তখনও বর্ত্তমান ; কানাইলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, সময় কি হয়েছে ? কমিশানার সাহেব জানাইলেন যে, এখনও একটু দেরী আছে। কানাইলাল একটু দেরী আছে শুনিয়া তাহার অনুমতি লইয়া, প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিতে গেলেন।

জেলের ঘড়িতে ছয়টা বাজিল—দুইটি হাত পৃষ্ঠদেশে বদ্ধাবস্থায় কানাইলালকে বধ্যভূমিতে আনা হইল এবং তাঁহাকে মৃত্যু-পরওয়ানাখানি পড়িয়া শুনান হইলে ; শান্তভাবে তিনি তাহা শুনিলেন।

অতঃপর তিনি নিজেই ফাঁসিমঞ্চে আরোহন করিলেন। ফাঁসির পূর্ব্বে একখানি কাল কাপড় মুখে ঢাকা দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে, কারণ ফাঁসির দড়িটি পরাইবার সময় যাহাতে আসামী ভীত না হয় সেই জন্যই বোধহয় এই নিয়ম। কাল কাপড় দিয়া কানাইলালের মুখখানি যখন একব্যক্তি ঢাকিতে আসিল—তখন কানাইলাল মৃদু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন অনুগ্রহ করিয়া আমার মুখখানি কাল করিয়া দিবেন না ? (Please do not blacken my face)

কানাইলালের শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল ; কেবল চক্ষু দুইটিতে আবরণ দেওয়া হইল। তাহার পর জল্লাদ আসিয়া ফাঁসির দড়ি তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল। তাঁহার হাস্যময় মুখখানি তখন স্বর্গীয় শোভায় প্রদীপ্ত—ঠাট্টা করিয়া জল্লাদকে

বলিলেন “দড়িটা বড় জোর হ’য়েছে।” তাঁহার প্রফুল্ল বদন দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, সকলের চক্ষু দিয়া মুক্তার মত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল ; চক্ষের নিমিষে তাঁহার পায়ের তলার কাঠখানি সরিয়া গেল ; আর তাহার প্রাণহীন দেহখানি সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল।

জেলের মধ্যে মতিবাবু এবং কানাইয়ের ভ্রাতা আশুবাবু মৃতদেহ আনিতে গিয়াছিলেন ; মতিবাবু লিখিয়াছেন—অতি সন্তর্পণে কম্বলখানি অপসারিত করা মাত্র কি দেখিলাম, সে তপস্বী কানাইয়ের দিব্য রূপের পরিচয় দিবার ভাষা নাই—দীর্ঘ কেশ প্রশস্ত ললাট ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র যেন এখনও অমৃত আস্বাদে ঢুলু ঢুলু। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুটে সঙ্কল্পের জাগ্রত রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে, আজানুলম্বিত বাহুযুগল মুষ্টিবদ্ধ। আশ্চর্য্য! মৃত্যু যন্ত্রণার একটি কুঞ্চিত বীভৎস চিহ্নও কানাইয়ের কোন অঙ্গে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল উভয় স্কন্ধ রজ্জুর পীড়নে নমিত হইয়া পড়িয়াছে, মৃত্যুর ছায়া সে পবিত্র মুখশ্রী একটুও বিকৃত করিতে পারে নাই।

কানাইলালের ভ্রাতা এবং মতিবাবু কাঁদিতে লাগিলেন, সেই সময় জেলের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন—“আপনারা কাঁদিতেছেন কেন ? এইরূপ বীর যুবক যে দেশে জন্মিয়াছে

সে দেশ ধন্য। জন্মিলে তো মরিতেই হইবে—কিন্তু এইরূপ ভাবে বীরের ন্যায় মরিতে কয়জন পারে ?”

শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী এই কথাগুলি বলিতেছিলেন এবং নিজেও কাঁদিতেছিলেন। তিনি পুনরায় বলেন—“আমি একজন কারারক্ষী কানাইলালের সহিত আমার অনেক কথা হইত ; মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়ার পর তাহার প্রফুল্লতা আ[illegible] বাড়িয়া গিয়াছিল। কাল সন্ধ্যার পর তাহার মুখে এমন মিষ্টি হাসি দেখিয়াছি, তাহা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমি বরং তাহাকে বলিয়াছিলাম ‘কানাই আজও হাসিতেছ—কাল কিন্তু মৃত্যুর ছায়ায় তোমার প্রফুল্ল ঠোঁট দুখানি কাল হইয়া যাইবে।’

দুর্ভাগ্যবশতঃ কানাইয়ের মৃত্যুকালেও আমায় তাহার নিকট উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল্। কানাইয়ের চক্ষে আবরণ—সে যখন ধাপের পর ধাপ উঠিয়া রজ্জুতে কণ্ঠসংলগ্ন করিতে উদ্যত—ঠিক এমনই সময়ে আমার সাড়া লইল, তারপর তেমনি হাসিতে হাসিতে কহিল—মিষ্টার আমায় তুমি কেমন দেখিতেছ ?—এমন বীরত্ব রক্তমাংসের মানুষে সম্ভব হয় না।*

ফাঁসির পর ডাক্তার নীল কানাইলালের দেহ পরীক্ষা করিয়া মৃত্যু ঘোষণা করিলেন, জুরীগণও মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মত

* কানাইলাল—শ্রীমতিলাল রায়

প্রকাশ করিবার পর, তাঁহার নশ্বর দেহ শ্রীআশুতোষ দত্তের হস্তে অর্পিত হইল।

উপেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজ শাসিত ভারতে তাহার স্থান হইল না। না হবারই কথা। কিন্তু ফাঁসির সময় তাহার নির্ভিক প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা বেশ একটু ভ্যাবাচাকা হইয়া গেলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী আসিয়া চুপি চুপি বারীনকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের হাতে এ রকম ছেলে আর কতগুলি আছে?'

কানাইলাল মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পুর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার বীরত্ব ও প্রসন্নতা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মানুষের মৃত্যুর ভয়ই হইতেছে চুড়ান্ত ভয়, তিনি সেই ভয়কে জয় করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষায় তিনি হাসিমুখে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই তিনি আজ অমর—অক্ষয়!

১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসি হইবে, তাহা পুর্ব্বেই খবরের কাগজের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল সেই জন্য জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, গুজরাটী, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ দলে দলে জেলের সম্মুখে আসিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে এক মাইল ব্যাপি এক বিরাট জনসঙ্ঘ সেই স্থানে কানাইলালের পুণ্যদেহ বহন করিবার জন্য

সমবেত হইল এবং 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে ভারতের ইতিহাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের পার্থিব দেহ বহন এবং তাঁহাদিগকে শেষ দর্শন করিবার জন্য দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে সমবেত হন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেন। কিন্তু কানাইলালের জন্য যে সার্ব্বজনীন শোকোচ্ছ্বাস এবং বিরাট লোক সমাগম হয়, তাহা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই এবং সেইরূপ জন-সমাগম পরবর্ত্তীকালে একমাত্র দেশবন্ধুর শোক-যাত্রার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

বেলা নয়টার পর কানাইলালের ভ্রাতা, মতিবাবু ও আর যাঁহারা কানাইলালের শবদেহ আনিতে গিয়াছিলেন, তাহারা কানাইয়ের জেলের পোষাক (হাফ-প্যাণ্ট ও সার্ট) খুলিয়া একখানি লাল পাড় ধুতি পরাইয়া দিলেন এবং গলায় একটি কোঁচান চাদর দিয়া, তাঁহার দেহ একটি সুসজ্জিত খাটের উপর শোয়াইয়া, মাল্য চন্দনে ভাল করিয়া সাজাইয়া, জেলের প্রহরীর নির্দ্দেশিত একটি সরু পথ দিয়া তাহারা জেলের বাহিরে আসিলেন।

জেলের বাহিরে চঞ্চল জনসঙ্ঘ শোকাকুল চিত্তে বাষ্পাকুল লোচনে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের পার্থিব পুণ্যদেহের প্রতি হৃদয়ের

ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কানাইলালের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দেহ * বাহিরে আসিবামাত্র সাগর গর্জ্জনের মত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হইল; শত শত শঙ্খ একসঙ্গে নিনাদিত হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার শবাধারে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

সেই বিরাট জন সমুদ্র আলিপুরের রাস্তা দিয়া জজকোর্ট রোড ধরিয়া কালীঘাট পুল পার হইয়া কালীঘাট রোডে আসিয়া পড়িল। হাজরা রোডের মোড় হইতে কালীঘাটের মহাশ্মশান পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে, দোকানের অলিন্দে দরজার সম্মুখে যে যেখানে সামান্য একটু স্থান পাইয়াছিল, সেইস্থানে অতি কষ্টে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরকে শেষ দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পথিপার্শ্বস্থ বাড়িগুলির ছাদে, বারান্দায় পুরনারীরা সজল নয়নে পুষ্প, লাজ ও শঙ্খ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না।

শঙ্খধ্বনি ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে শোকযাত্রা ধীরে ধীরে ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান কালীঘাটের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। স্বর্গীয় হরিদাস হালদার

---

* জেলের ভিতর হইতে কানাইলালের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বাহির করিতে পুলিশ কমিশ্যনার মিঃ হ্যালিডে আপত্তি করায় তাঁহার দেহ একখানি কাল কম্বলে আবৃত করিয়া জেলের বাহিরে আনা হয়।

প্রমুখ কালীমাতার সেবায়েতগণ এবং তাহাদের গুরুবংশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ সজল নয়নে মায়ের চরণামৃত তাঁহার মুখে দিয়া দিলেন এবং মায়ের গলদেশ হইতে আনীত একটী বৃহৎ ফুলের মালা কানাইলালের গলায় পরাইয়া দিলেন। সে কি মহান দৃশ্য! কানায়ের ন্যায় এমন ভাগ্যধর কে আছে, যে মৃত্যুকে জয় করিয়া এমন অমরত্ব লাভ করিতে পারে?

ধীরে ধীরে জন সমুদ্র কানাইলালের শব লইয়া কেওড়াতলায় উপস্থিত হইল। সেখানে ভোর হইতেই লোক সমাগম হয় এবং বেলা আট ঘটিকার মধ্যেই তাহা ভরিয়া যায়। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র মহিলা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবিশ্বরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বহু স্বেচ্ছাসেবক শ্মশানে পূর্ব্ব হইতে দাহ কার্য্যের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কানাইলালের শোভামাত্রা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় লিখিয়াছেন—"জেল প্রহরী আমাদের যে পথ দেখাইয়া দিল তাহা অতি অপ্রশস্ত, একদিকে সারি সারি পায়খানা, অন্যদিকে আদি গঙ্গা; সরু পুলের উপর দিয়া অতি কষ্টে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম; সম্মুখে সমুদ্রতরঙ্গের মত নরমুণ্ড দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিল, সাগর গর্জ্জনের মত "বন্দেমাতরম্" শব্দে আমাদের কর্ণ পটাহ ছিন্ন হইবার উপক্রম করিল—দেখিতে দেখিতে আমরা জনসমুদ্রে ডুবিয়া গেলাম।

তাহার পর যে কি হইল কিছুই বুঝা গেল না, সে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কেমন করিয়া কানাইলালকে লুফিতে লুফিতে শ্মশানের পথে ছুটিল, কোথায় শবগাত্র আবরণের বস্ত্র উড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ ফুলের মালা কোথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া অজস্র বর্ষণ আরম্ভ হইল, কিছুরই নিরাকরণ রহিল না। শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতের সকল প্রদেশ হইতে এত লোক যে কানাইলালের শ্মশান যাত্রায় যোগ দিতে উপস্থিত হইবে, এ ধারণাই আমাদের ছিল না, কানাইলালের শেষ সাধ পূর্ণ করিতে স্বয়ং বিধাতা যেন হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন, আমরা নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল সে দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম।"

কানইলালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য মণ মণ ঘৃতও চন্দনকাষ্ঠ আসিতে লাগিল; বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার ঘৃতলিপ্ত দেহ সুসজ্জিত চিতার উপর স্থাপিত হইল। স্বেচ্ছাসেবকগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অসংখ্য নরনারী সেই পথ দিয়া কানাইলালের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে লাগিল, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না।

শ্মশানে কানাইলালের দাদা আশুবাবুকে, তাহার ভ্রাতার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি শোকে ম্রীয়মান থাকায়, শ্রীমতিলাল রায় একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া কানাই-

লালের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী বর্ণনা করিলেন, জনতা নীরব নিস্তব্ধভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর কানাইয়ের একখানি শেষ ফটো গ্রহণ করা হইল। উক্ত ফটোখানি এই পুস্তকে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তারপর আশুবাবু চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন ; চিতা ধূমে গগন মণ্ডল, কানাইলালের বিয়োগে ভারাক্রান্ত অসংখ্য নরনারীর মুখমণ্ডলের ন্যায়, মসি মলীন হইয়া গেল অগ্নি-শিখা আকাশে গিয়া ঠেকিল ; চতুৰ্দ্দিক হইতে বন্দেমাতরম্ ও হরি-ধ্বনিতে গগন পবন আবার মুখরিত হইয়া উঠিল।

কানাইলালের চিতানল ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল ; লক্ষ লক্ষ লোকের সংগৃহীত চন্দন কাঠ ও টিনের পর টিন ঘৃত চিতার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—রারণের চিতার ন্যায় চিতা অবিরত জ্বলিয়া, তাঁহার পূণ্য দেহকে পঞ্চভূতে মিশাইয়া দিল।

সন্ধার পূর্ব্বে অতি কষ্টে চিতা নির্ব্বপিত করিবার পর শ্মশানে যে দৃশ্য দেখা গেল, সেইরূপ মৰ্ম্মস্পর্শী দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই ; কানাইলালের চিতাভস্ম একটুখানি রাখিবার জন্য শ্মশানের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলালের ভস্ম নিজের কাছে রাখিয়া “মানুষ” হইতে চায়, যেন দীনতা, ভয়, মৃত্যু, আর তাহাদের কখনও স্পর্শ করিতে না পারে। কানাইলালের মৃত্যু যেন বাঙ্গালীর ঘুমন্ত প্রাণকে সজাগ করিয়া দিল—

তাহার পর যে কি হইল কিছুই বুঝা গেল না, সে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কেমন করিয়া কানাইলালকে লুফিতে লুফিতে শ্মশানের পথে ছুটিল, কোথায় শবগাত্র আবরণের বস্ত্র উড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ ফুলের মালা কোথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া অজস্র বর্ষণ আরম্ভ হইল, কিছুরই নিরাকরণ রহিল না। শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতের সকল প্রদেশ হইতে এত লোক যে কানাইলালের শ্মশান যাত্রায় যোগ দিতে উপস্থিত হইবে, এ ধারণাই আমাদের ছিল না, কানাইলালের শেষ সাধ পূর্ণ করিতে স্বয়ং বিধাতা যেন হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন, আমরা নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল সে দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম।"

কানইলালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য মণ মণ ঘৃতও চন্দনকাষ্ঠ আসিতে লাগিল; বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার ঘৃতলিপ্ত দেহ সুসজ্জিত চিতার উপর স্থাপিত হইল। স্বেচ্ছাসেবকগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অসংখ্য নরনারী সেই পথ দিয়া কানাইলালের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে লাগিল, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না।

শ্মশানে কানাইলালের দাদা আশুবাবুকে, তাহার ভ্রাতার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি শোকে ম্রীয়মান থাকায়, শ্রীমতিলাল রায় একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া কানাই-

লালের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী বর্ণনা করিলেন, জনতা নীরব নিস্তব্ধভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারপর কানাইয়ের একখানি শেষ ফটো গ্রহণ করা হইল। উক্ত ফটোখানি এই পুস্তকে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তারপর আশুবাবু চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন; চিতা ধূমে গগন মণ্ডল, কানাইলালের বিয়োগে ভারাক্রান্ত অসংখ্য নরনারীর মুখমণ্ডলের ন্যায়, মসি মলীন হইয়া গেল অগ্নি-শিখা আকাশে গিয়া ঠেকিল; চতুর্দ্দিক হইতে বন্দেমাতরম্ ও হরি-ধ্বনিতে গগন পবন আবার মুখরিত হইয়া উঠিল।

কানাইলালের চিতানল ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল; লক্ষ লক্ষ লোকের সংগৃহীত চন্দন কাঠ ও টিনের পর টিন ঘৃত চিতার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল—রাবণের চিতার ন্যায় চিতা অবিরত জ্বলিয়া, তাঁহার পূণ্য দেহকে পঞ্চভূতে মিশাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অতি কষ্টে চিতা নির্ব্বপিত করিবার পর শ্মশানে যে দৃশ্য দেখা গেল, সেইরূপ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই; কানাইলালের চিতাভস্ম একটুখানি রাখিবার জন্য শ্মশানের মধ্যে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল। সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলালের ভস্ম নিজের কাছে রাখিয়া "মানুষ" হইতে চায়, যেন দীনতা, ভয়, মৃত্যু, আর তাহাদের কখনও স্পর্শ করিতে না পারে। কানাইলালের মৃত্যু যেন বাঙ্গালীর ঘুমন্ত প্রাণকে সজাগ করিয়া দিল—

বাঙ্গলার নরনারী কানাইয়ের চিতাভস্ম লইয়া সেই গোধূলী লগ্নেই প্রতিজ্ঞা করিল—"**হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে আমাদের কাপুরুষতা দুর্ব্বলতা দূর করো আমাদের মানুষ করো।**"

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন :

"চিতা নির্ব্বাণের পরে অস্থি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, একমুষ্টি ভস্ম গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল। তারপর চূর্ণ অস্থির অন্বেষণ ও ভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি ; কাহারও সোনার কৌটা, কাহারও রৌপ্যের, কাহারও গজদন্তের, এমন হাজার হাজার নরনারী এক টুকরা অস্থি, এক মুঠা ভস্মের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল—আমরাও একখণ্ড অস্থি রৌপ্য কৌটায় লইয়া বাটী ফিরিলাম।"

যতদিন বাঙ্গলা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে—ততদিন বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে কানাইলালের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাকিবে ; তাঁহার মহান আদর্শ, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, যুগ যুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে পথ দেখাইয়া দিবে। জাতির বহু শতাব্দীর সুপ্ত ক্ষাত্র শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে তরান্বিত করিবার জন্য দেশদ্রোহীর শাস্তিবিধান কল্পে, তিনি নিজ জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিলেও—তাঁহার অম্লান স্মৃতি 'হারমোডিয়াসের' ন্যায় নবজাগ্রত জাতির হৃদয়ে চিরদিন শক্তি সঞ্চার করিবে !

বন্দেমাতরম্

—নয়—

পরিশিষ্ট

কানাইলালের তিরোধানের চল্লিশ বৎসর পর, (১০ই নভেম্বর ১৯৪৭) তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় যে, প্রথম স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহার কার্য্যবিবরণী আনন্দ-বাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

গত সোমবার সায়াহ্নে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক মহতী স্মৃতিসভায় কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ বাঙ্গলার অগ্নিযুগের চিরস্মরণীয় বিপ্লবী বীর কানাইলাল দত্তের পূণ্যস্মৃতির প্রতি তাহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৯০৮ সালে ১০ই নভেম্বর, ফাঁসীর মঞ্চে কানাইলাল আত্মবিসর্জন করিয়াছিল।

অগ্নিযুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

কালীঘাটের মহাশ্মশানে যে স্থলে কানাইলালের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, তথায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের এক প্রস্তাব অনুষ্ঠানে গৃহীত হয়।

বাঙ্গলার নরনারী কানাইয়ের চিতাভস্ম লইয়া সেই গোধুলী লগ্নেই প্রতিজ্ঞা করিল—"**হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে আমাদের কাপুরুষতা দুর্ব্বলতা দূর করো আমাদের মানুষ করো।**"

এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

"চিতা নির্ব্বাণের পরে অস্থি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, একমুষ্টি ভস্ম গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল। তারপর চূর্ণ অস্থির অন্বেষণ ও ভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি ; কাহারও সোনার কৌটা, কাহারও রৌপ্যের, কাহারও গজদন্তের, এমন হাজার হাজার নরনারী এক টুকরা অস্থি, এক মুঠা ভস্মের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল—আমরাও একখণ্ড অস্থি রৌপ্য কৌটায় লইয়া বাটী ফিরিলাম।"

যতদিন বাঙ্গলা থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে—ততদিন বাঙ্গালীর মনোমন্দিরে কানাইলালের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া থাকিবে ; তাঁহার মহান আদর্শ, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, যুগ যুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গালী জাতিকে পথ দেখাইয়া দিবে। জাতির বহু শতাব্দীর সুপ্ত ক্ষাত্র শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে তরান্বিত করিবার জন্য দেশদ্রোহীর শাস্তিবিধান কল্পে, তিনি নিজ জীবনের পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিলেও—তাঁহার অম্লান স্মৃতি 'হারমোডিয়াসের' ন্যায় নবজাগ্রত জাতির হৃদয়ে চিরদিন শক্তি সঞ্চার করিবে !

বন্দেমাতরম্

—নয়—

পরিশিষ্ট

কানাইলালের তিরোধানের চল্লিশ বৎসর পর, (১০ই নভেম্বর ১৯৪৭) তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় যে, প্রথম স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান হয়, তাহার কার্য্যবিবরণী আনন্দ-বাজার পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

গত সোমবার সায়াহ্নে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টি-টিউট হলে অনুষ্ঠিত এক মহতী স্মৃতিসভায় কলিকাতার অধি-বাসিবৃন্দ বাঙ্গলার অগ্নিযুগের চিরস্মরণীয় বিপ্লবী বীর কানাই-লাল দত্তের পুণ্যস্মৃতির প্রতি তাহাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৯০৮ সালে ১০ই নভেম্বর, ফাঁসীর মঞ্চে কানাইলাল আত্মবিসর্জন করিয়াছিল।

অগ্নিযুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

কালীঘাটের মহাশ্মশানে যে স্থলে কানাইলালের নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, তথায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের এক প্রস্তাব অনুষ্ঠানে গৃহীত হয়।

উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, শ্রীযুত সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া, সভায় একটি স্মৃতি সমিতি গঠন করা হয়।

সভায় একটি প্রস্তাবে শহীদ কানাইলাল দত্তের বি-এ উপাধি অর্জনের বিষয়টি নথীভুক্ত করার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় একদিন সাম্রাজ্য-বাদীদের চাপে পড়িয়া কানাইলাল দত্তের বি-এ ডিগ্রী তথা-কথিত দুর্নীতির জন্য খারিজ করিয়াছিলেন।

শহীদ কানাইলাল দত্তের কর্মক্ষেত্রে চন্দননগরের অধি-বাসিবৃন্দ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আন্দোলন করিতেছেন, সভায় অপর এক প্রস্তাবে তাহার প্রতিও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

মেয়র শ্রীযুত রায় চৌধুরী সভায় উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, কানাইলাল জেলের মধ্যে কি ভাবে বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কানাইলাল ও সত্যেন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইহা করিয়াছিলেন। দেশের জন্যই তাঁহারা আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। সততা, শৃঙ্খলাবোধ, সংযম ও আত্মত্যাগের যে আদর্শ শহীদেরা রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শকে অনুসরণ করিলেই তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানান হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন শহীদ-দিগের স্মৃতিরক্ষার জন্য দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম প্রস্তাবে টাউন হলে শহীদগণের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী রক্ষার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কলিকাতায় ইউরোপীয়গণের নামানুসারে যে সকল রাস্তার নাম রাখা হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে শহীদগণের নামানুসারে উহার নামকরণ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক শহীদের নামে যাহাতে এই সকল রাস্তার নাম পরিবর্তন করা যায়, তজ্জন্য প্রবীন বিপ্লবীদের সহানুভূতি প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, প্রবীণ বিপ্লবীরা যদি এতদুদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন এবং কোন্ কোন শহীদের নামে কোন্ কোন রাস্তার নাম পরিবর্তন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সুপারিশ করেন, তাহা হইলে এই বিষয়ে বহু অসুবিধা দূর হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সভার আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনের কার্য্যকলাপ সুবিদিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, যখন স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইত না, তখনও তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, কানাইলাল মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সাধারণ জীবনের গতানু গতিক-তাকে বর্জন করিয়া এইরূপে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য তিনি

উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে, শ্রীযুত সুরেশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া, সভায় একটি স্মৃতি সমিতি গঠন করা হয়।

সভায় একটি প্রস্তাবে শহীদ কানাইলাল দত্তের বি-এ উপাধি অর্জনের বিষয়টি নথীভুক্ত করার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় একদিন সাম্রাজ্য-বাদীদের চাপে পড়িয়া কানাইলাল দত্তের বি-এ ডিগ্রী তথা-কথিত দুর্নীতির জন্য খারিজ করিয়াছিলেন।

শহীদ কানাইলাল দত্তের কর্মক্ষেত্রে চন্দননগরের অধি-বাসিবৃন্দ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আন্দোলন করিতেছেন, সভায় অপর এক প্রস্তাবে তাহার প্রতিও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

মেয়র শ্রীযুত রায় চৌধুরী সভায় উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, কানাইলাল জেলের মধ্যে কি ভাবে বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কানাইলাল ও সত্যেন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইহা করিয়াছিলেন। দেশের জন্যই তাঁহারা আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। সততা, শৃঙ্খলাবোধ, সংযম ও আত্মত্যাগের যে আদর্শ শহীদেরা রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শকে অনুসরণ করিলেই তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানান হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন শহীদ-দিগের স্মৃতিরক্ষার জন্য দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম প্রস্তাবে টাউন হলে শহীদগণের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী রক্ষার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কলিকাতায় ইউরোপীয়গণের নামানুসারে যে সকল রাস্তার নাম রাখা হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে শহীদগণের নামানুসারে উহার নামকরণ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক শহীদের নামে যাহাতে এই সকল রাস্তার নাম পরিবর্তন করা যায়, তজ্জন্য প্রবীন বিপ্লবীদের সহানুভূতি প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, প্রবীণ বিপ্লবীরা যদি এতদুদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন এবং কোন্ কোন শহীদের নামে কোন্ কোন রাস্তার নাম পরিবর্তন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সুপারিশ করেন, তাহা হইলে এই বিষয়ে বহু অসুবিধা দূর হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সভার আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার স্বল্পস্থায়ী জীবনের কার্য্যকলাপ সুবিদিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, যখন স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইত না, তখনও তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, কানাইলাল মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সাধারণ জীবনের গতানু গতিক-তাকে বর্জন করিয়া এইরূপে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য তিনি

নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও অবগত আছেন যে, কানাইলালের প্রতি ফাঁসির আদেশ দান ও তাঁহার ফাঁসির মধ্যে যেটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল, তাহার মধ্যেই তাঁহার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কানাইলাল তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁহার বীরত্ব ও প্রসন্নতা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য বলেন যে, মৃত্যুর ভয়ই হইতেছে চূড়ান্ত ভয়, কিন্তু কানাইলালের জীবন হইতে তাঁহারা সেই ভয়কে জয় করার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। এই শিক্ষাকে এমন ভাবে গ্রহণ করা উচিত যে, তাঁহাদের জীবন মৃত্যুর পরীক্ষার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইলে যেন দেশবাসী বলিতে পারে যে, তাঁহারা সার্থক জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর সভায় শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। উহাতে তিনি কানাইলালের স্মৃতির উদ্দেশে একটি "বীরসেনা" বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন।

শ্রীযুত মাখনলাল সেন বলেন যে, কানাইলাল যে সাধনার জন্য আত্মবলি দিয়াছেন আজ তাহা সার্থক হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের চতুর্দিকে বিপদ ঘনীভূত হইতেছে। তরুণদিগের এক্ষণে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কানাইলাল প্রমুখ শহীদগণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের সংগঠিত করা উচিত। বাঙ্গলায়

কানাইলাল দত্ত স্মৃতি সমিতি

সভায় নিম্নোক্তরূপ স্মৃতি সমিতি গঠিত হয় :—

সভাপতি—শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুত হরিহর শেঠ ও শ্রীযুত মতিলাল রায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত ভবতোষ ঘটক।

সভ্যগণ—শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্রীযুত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র দে, শ্রীযুত অরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র, শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত গণপতি সরকার, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত বলাইচাঁদ দে।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুত সুধীরকুমার মিত্র কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

সমাপ্ত